KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA

18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ৩ নং হেস্টিংস স্ট্রীট, কলকাতা
Collection : KLMLGK	Publisher : প্রমথ চৌধুরী
Title : সবুজ পত্র (Sabuj Patra)	Size : 7.5" x 6"
Vol. & Number : 5/6 5/7-8 5/9 5/10 5/11 5/12	Year of Publication : আশ্বিন ১৩২৫ কার্তিক - অগ্রহায়ণ ১৩২৫ পৌষ ১৩২৫ মাঘ ১৩২৫ ফাল্গুন ১৩২৫ চৈত্র ১৩২৫
	Condition : Brittle / Good
Editor : প্রমথ চৌধুরী	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

একটা অসম্ভব গল্প।

—:※:—

চার বছরের বিয়ে-করা স্ত্রী রেবামিনি যখন আঠার বছর বয়সে সন্ন্যাস রোগে হঠাৎ মারা গেল, তখন আমার মনে হ'ল যেন আমার হৃদয়-বীণায় যে-কটা তার ছিল, সে-কটা একেবারে পট্ পট্ করে' ছিঁড়ে গেল। দুঃখ অনুভব করবার সুখটাও আমার আর রইল না।

সন্ধ্যা হয় হয়, এমন সময় শ্মশান থেকে ফিরে এলুম। মনে হ'ল কে আমার হৃদয়-বীণায় তারগুলো আবার চড়িয়ে দিয়েছে। আর সেখানে কে যেন সবগুলো তারে পূরবীর সুর বসিয়ে একটা দীর্ঘ-শ্বাসের সঙ্গে বিশাল ক্রন্দনে সকল বিশ্ব সকল চরাচর ডুবিয়ে দিচ্ছে। সন্ধ্যার পাতলা আঁধার বিষাদ মেখে যেন বাদুড়ের পাখার মতো হ'য়ে উঠেছে। বাতাসে বাতাসে একটা ক্রন্দনের রোল ঘুরে ঘুরে আশ্রয়ের নিষ্ফল সন্ধানে ফিরছে। এ জগতে তার কেউ নেই, কিছু নেই—আছে যেন একটা স্বপ্নের স্মৃতি; কিন্তু সে স্বপ্ন যেন আজ উধাও হ'য়ে চলে' গেছে—সৃষ্টির একান্ত বাইরে।

শোবার ঘরে ঢুকে' দরজা বন্ধ করে' দিলুম। এই সেই শোবার ঘর—এ আজ কত মিথ্যা। কিম্বা মিথ্যাও ত নয়, মিথ্যা হ'লেও ত বেঁচে যেতুম। এ যে সত্য মিথ্যার সেই মাঝখানটাতে, যেখানে সত্য আপনার অধিকার ছাড়তে চায় নি—আবার মিথ্যাও আপনার পূর্ণ দখল খুঁজে পায় নি।

টেবিলের উপরে আলো জ্বলছিল। আল্‌নাতে নিত্য ব্যবহারের কোঁচান দুখানা সাড়ী শুঁড়ে শুঁড়ে জড়িয়ে ঝুলছে। টেবিলের উপরে "নৌকাডুবি" বইখানা যতদূর পড়া হয়েছে সেই খানটা একটা চুলের কাঁটা দিয়ে চিহ্নিত হ'য়ে নিতান্ত পরিত্যক্ত ভাবে পড়ে' আছে। জড়-বস্তুরও কি অনুভব করবার ক্ষমতা আছে? আমার ত সেদিন ঠিক সেই রকমই মনে হ'ল। সিঁদূরের কৌটাটি অর্দ্ধেক খোলা অবস্থায় একটা ব্র্যাকেটের উপরে পড়ে' রয়েছে। আমার অন্তর থেকে কণ্ঠের মধ্যে কি যেন একটা বড় ড্যালা ঠিক্‌রে ঠিক্‌রে বেরিয়ে আসতে চাইচে। আমি মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে' বিছানায় মুখ লুকিয়ে চার বছরের শিশুর মতো ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদলুম।

কিন্তু আপনারা সবাই জানেন যে, যে-ক্ষতি পূরণ হবার কোন দিনই সম্ভাবনা নেই, সে ক্ষতিকে ধরে' মানুষ চিরকাল থাকে না। সে ক্ষতির যে দুঃখ সে-দুঃখের বিরুদ্ধে মানুষের অন্তর থেকে একটা সংগ্রাম আপনা হ'তেই আরম্ভ হ'য়ে যায়। তাই আমারও অন্তরে যে দুঃখ একদিন অতি স্পষ্ট ছিল অতি সত্য ছিল, তা কালের অব্যর্থ প্রলেপে ধীরে ধীরে আবছা হ'য়ে উঠতে লাগল। তারপর এমন একদিন এলো যখন দেখলুম যে রেবামিনির স্মৃতি আছে কিন্তু তার জন্য দুঃখ নেই। আসলে যা রইল তা হচ্ছে অতীতকে নিয়ে একটা সেন্‌টিমেণ্টালিজ্‌ম্।

আপনারা হয়ত বলবেন, যে-দুঃখ যে-ক্ষতি জীবনে এমন স্পষ্টতম ছিল, সে ক্ষতি সে দুঃখের এমন পরিণাম মানুষের পক্ষে লজ্জা জনক। কিন্তু মনে রাখবেন আমি আপনাদের উপন্যাস বলতে বসি নি—যা সত্যিই ঘটেছে তাই বলছি।

সে যা হোক্, রেবামিনি মারা যাওয়ার মাস আষ্টেক পর

যখন মা আমায় আবার বিয়ে করবার জন্যে ধরে' বসলেন, সে সময়ে আমার অন্তরে বিয়ে করা সম্বন্ধে এমন একটা জোরের "না" ছিল না, যা সে-অনুরোধের বিরুদ্ধে খাঁড়া হ'য়ে দাঁড়াতে পারে। অবশ্য আমার বিয়ে করবার আগ্রহ যে একটুও ছিল, তা নয়। তবে আমি বিয়ে করলে মা যে সুখী হবেন এটা জানতুম। সুতরাং যেটার সম্বন্ধে আমার নিজের মনে একটা প্রবল "না" ছিল না, অথচ যেটা করলে মা সুখী হবেন—মার সে অনুরোধে আমি "হাঁ" "না" কিছুই করলুম না। মা-ও 'মৌনং সম্মতি লক্ষণং' ধরে নিয়ে আমার দ্বিতীয় গৃহিণীর সন্ধানে লাগলেন। বাঙলা দেশে আর যারই অভাব হোক্ না কেন, আঠার থেকে আশী বছর পর্য্যন্ত যে-কেউ বিয়ে করতে চাক্ না কেন, কারোরই মেয়ের অভাব হয় না। আর বিশেষত আমার বয়েস ত তখন সবে আটাশ। ফলে বছর ঘুরতে না ঘুরতেই চঞ্চলার সঙ্গে আমার দ্বিতীয়-বার বিয়ে হ'য়ে গেল।

বাঙালীর সমাজে পুরুষ নারীর মধ্যে এমন একটা কঠিন যবনিকার ব্যবধান আছে, যাতে করে' বাঙালী তরুণ-তরুণী পরস্পরের কাছে যেমন রহস্যময় ও রহস্যময়ী, পৃথিবীর আর কোন দেশে তেমন নয়। বাঙলার নব-দম্পতীর মধ্যে এই যবনিকাটি কতকটা অপসারিত হয়—শুভ-দৃষ্টির সময়ে নয়, বাসর ঘরে নয়, বিয়ের সময়কার শত কোলা-হলের মধ্যে নয়—সেটা হয় তাদের প্রথম রজনীর নিরালা মিলনে—প্রথম রজনীর সম্ভাষণে। সেদিন দূর কাছে আসে, রহস্য উন্মুক্ত হ'য়ে দৃষ্টির অতি নিকটে আসে—যা এতদিন চোখে পর্য্যন্ত দেখা যায় নি, তা একেবারে স্পর্শের সীমায় এসে পড়ে। সেই জন্যে এই রজনীটি বাঙালী তরুণ তরুণীর পক্ষে আশায় আকাঙ্ক্ষায় কৌতূহলে একেবারে পরিপূর্ণ।

আমার পুরুষের প্রাণ নারীর জন্যে অবশ্য তেমন সজাগ ছিল না। কেননা সে প্রাণের তন্ত্রী নারীর স্পর্শে একবার বেজে উঠেছিল, সেখানে আর সেই একই কারণে নতুন উন্মাদনা সৃষ্টির সম্ভব ছিল না। কারণ, মানুষের জীবনে একই বিষয়ের অনুভব দ্বিতীয়বার তেমন তীব্র ও তেমন তীক্ষ্ণ হয় না। অজ্ঞাত যা, অপূর্ব যা, তার সম্মোহন যতটা, জ্ঞাত যা দখলে এসেছে একবার যা জেনেছি, তার মাদকতা, ততটা নয়।

কিন্তু তাই বলে' ঐ যে একটি জীব যার সঙ্গে আমার চির-জীবনের সম্বন্ধ, তার সম্বন্ধে যে আমার কোনই কৌতূহল ছিল না, এটা যদি আপনারা মনে করেন, তবে আপনাদের পক্ষে মানুষের চিরন্তন প্রকৃতিকেই অস্বীকার করা হবে। তাই সেদিন যখন রাতের খাওয়া দাওয়া শেষ করে' পান চিবুতে চিবুতে শোবার ঘরে একখানা ঈজি-চেয়ারে হেলান দিয়ে একখানা বাঙলা মাসিকের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে তার গালাগালির বহরটা একবার নির্ণয় করতে ব্যাপৃত ছিলুম, তখন যখন বাহিরের বারান্দা থেকে মলের একটা সলজ্জ টিনি টিনি শব্দ আমার কানে এসে বাজল, তখন আমার মনটা "মোহমুদ্গরের" শ্লোক আওড়াবার জন্যে মোটেই ব্যস্ত হ'য়ে উঠল না। এমনি সময়ে এমনি অবস্থায় ওমনি মলের শব্দ আরও একদিন আমার শোবার ঘরের সামনে অমনি সলজ্জ হ'য়েই বেজেছিল; কিন্তু সেদিন ওই শব্দ শুনে আমার বুকের বাঁ পাশটা একেবারে অচেতন ছিল না, সেদিন ঐ মলের শব্দের সঙ্গে সঙ্গে আমার সামনে একটা নূতন জগতের রুদ্ধ কবাট অর্গলমুক্ত হবার আয়োজন করছিল। কিন্তু আজ আমার ও-জগতের সকল গানই শোনা হয়ে গেছে, আজ

আবার নূতন একজন, যিনি গীত বহন করে' আমার হৃদয়ের দ্বারে আসছেন, জানি তাঁর সে গীতের সঙ্গে আমার সে শোনা গানের কোনই প্রভেদ থাকবে না,—শব্দেরও নয়, অর্থেরও নয়, সুরেরও নয়—যদি কিছু প্রভেদ থাকে ত, সে একমাত্র তানের।

মলের শব্দ ধীরে ধীরে আমার শয়ন-কক্ষের দরজার পাশে এসে থামল, সঙ্গে সঙ্গে একটা সুগন্ধি কেশ-তৈলের মৃদু স্নিগ্ধ ও মিষ্ট গন্ধ আমার ঘরটার ভিতরে চারিয়ে গেল, আমার নির্জ্জীব ঘরটা যেন জেগে উঠল, আমিও সজাগ হয়ে ঈজি চেয়ারের উপরে উঠে বসলুম।

ঘরের দরজার পাশে মলের শব্দ থামার সঙ্গে সঙ্গে চুপি চুপি কি কথা আরম্ভ হ'য়ে গেল। বুঝলুম যে নববধূ একা আসেন নি। পর-ক্ষণে চঞ্চলাকে আমার ঘরের মধ্যে ঠেলে দিয়ে আমার ছোট বোন স্বর্ণ দুষ্টোমির হাসি হেসে বললে—"দাদা, এই রইল তোমার বউ, বুঝে পড়ে' নাও, যে লজ্জা মা গো মা!" সঙ্গে সঙ্গে আমার দরজাটাও বাহির থেকে সশব্দে বন্ধ হ'য়ে গেল।

চঞ্চলার প্রতি আমার দৃষ্টি ও মনোযোগ আকর্ষণ হবামাত্র আমার বুকের মধ্যে সজোরে কি একটা টক্ করে' উঠল। একটা আন্‌কোরা স্প্রিংকে দাবিয়ে রেখে চট্ করে' ছেড়ে দিলে সেটা যেমন লাফিয়ে ওঠে তেমনি করে' আমি চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠলুম। কে ও? কে ও? চঞ্চলা? না—না—ও তো রেবামিনি! এমনি প্রায় পাঁচ বছর আগে অমনি একখানি গোলাপী রঙের সাড়ী পরে' অমনি অবগুণ্ঠন টেনে অমনি ভঙ্গীতে অমনি করে' আমার শোবার ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিল। চঞ্চলা? না—না—ও যে একেবারে হুবহু রেবামিনি—আমারই মিনি। আমি দৌড়ে গিয়ে মিনিকে বুকে

তুলে নিলুম, তাকে বুকে করে' আলোর কাছে নিয়ে এলুম, একটানে মাথার ঘোমটা ফেলে দিলুম, তারপর তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলুম, না না, এ মিনি নয়, এ আর কেউ, আমি পাগলের মতো তৎক্ষণাৎ তাকে আলিঙ্গনমুক্ত করে দিলুম, এমনি করে' তাকে আমার কাছ থেকে সরিয়ে দিলুম যে, চঞ্চলা তাল সাম্‌লাতে না পেরে একেবারে সজোরে টেবিলের উপরে পড়ে' গেল, সঙ্গে সঙ্গে আলোটা উল্টে পড়ে' দপ্ করে' নিভে গেল—আমি বাগানের দিককার দরজাটা খুলে বাইরে গিয়ে বাগানের একটা পাথরের বেঞ্চির উপরে বসে' পড়লুম। আমার ভিতরে এখন আগুন ছুটছে, শরীরের উপরে ঘাম ছুটছে। আমি তখন কে? শ্রীরামপুরের নবীন জমিদার শ্রীবিভূতিরঞ্জন রায়? না—আমি তখন একজন বদ্ধ পাগল, আমার আসল জায়গা হচ্ছে পাগ্‌লা-গারদে।

কেমন করে' কোথায় দিয়ে রাত কেটে গেল! যখন বাহ্য প্রকৃতির জ্ঞান ফিরে এলো, তখন দেখলুম যে আমি তেমনি বেঞ্চির উপরে বসে' আছি, আর পূব আকাশে অন্ধকারের বুক চিরে আলো ফুটেছে। ভোরের হাওয়া বইতে সুরু করল, তার স্পর্শে আমার মাতাল মন কতকটা তাজা হ'য়ে উঠল। পূর্ব্বাকাশ ধীরে ধীরে লাল হয়ে উঠল। দিনের স্পষ্টতার মধ্যে রাত্রির ঘটনাটাকে একটা অতিদূর দুঃস্বপ্নের মতো প্রতীয়মান হ'তে লাগল, যেন সেটা আরব্য-উপন্যাসের একটা ছেঁড়া পাতা কোন ক্রমে উড়ে এসে আমার শয়নকক্ষে প্রবেশ করেছিল।

কিন্তু আরব্য-উপন্যাসের ছেঁড়া পাতাই হোক্ আর দুঃস্বপ্নই হোক্, সে-রাত্রির কোন ঘটনা যে আমার মনের উপরে কোনই ছাপ রেখে

গেল না তা নয়। আমি সেদিন স্পষ্ট বুঝলুম যে, মানুষের প্রতি-মুহূর্ত্তে যা তার স্পষ্ট, সেই টেই তার মিথ্যা। মানুষের মগ্ন-চৈতন্যের যে সত্য সে সত্য তার প্রবুদ্ধ চৈতন্যের সহস্র চাঞ্চল্যের কাছে প্রতি নিমেষেই হার মানছে। কিন্তু যখন একটা কিছু ইঙ্গিতে একটা কিছু ইসারায় একটা কিছুকে নিমিত্ত করে' সেই মগ্ন-চৈতন্যের সত্য বাইরের মনে বেরিয়ে আসে তখন প্রবুদ্ধ চৈতন্যের হাজার চাঞ্চল্য পালাবার পথ পায় না। আমার সেদিন মনের পাতায় যে-একটা গভীর দাগ পড়েছিল এ দাগ আগে থাকলে মা আমার কিছুতেই দ্বিতীয়বার বিয়ে দিতে পারতেন না—এটা ঠিক অনুভব করলুম।

তার পরদিন রাত্রে যখন চঞ্চলাকে সঙ্গে নিয়ে স্বর্ণ এসে আমার ঘরের সামনে দাঁড়াল তখন দেখলুম স্বর্ণর মুখ চোখ থেকে সে দুষ্টোমির হাসি কোথায় চলে' গেছে, তার ঠোঁটদুটো কি যেন একটা অভিমানের আঘাতে কঠিন হ'য়ে উঠেছে, তার চোখ দুটো থেকে কি যেন একটা প্রশ্ন তীক্ষ্ণশরের মতো আমার পানে বেরিয়ে আসছে। স্বর্ণ বললে—"দাদা, তুমি আর যাকেই ফাঁকি দাও না কেন, আমার নতুন কাণ নতুন চোখ, নতুন মনকে ফাঁকি দিতে পারবে না। তোমার বাগানের দিককার দরজায় আজ আমি বাহিরে থেকে শিকল এঁটে দিয়েছি—আর এ দরজারও তাই করব। যদ্দিন তুমি শিষ্ট হ'য়ে না ওঠো, তদ্দিন তুমি এমনি বন্দী অবস্থাতেই রাত কাটাবে।" স্বর্ণ চঞ্চলাকে ঘরের মধ্যে রেখে কবাট টেনে দিয়ে বাহিরের শিকলটা কড়ায় লাগিয়ে দিয়ে চলে' গেল।

অভাব্য যা, কল্পনারও অতীত যা, তাই যখন অপ্রত্যাশিত ভাবে দৃষ্টির আগে আসে তখন অসতর্ক মনে এমন একটা ওলোটপালোট

হয়ে যায় যে মানুষ তখন স্বভাবতই সংযম হারিয়ে বসে; কিন্তু যে কল্পনাতীতের জন্যে মনকে প্রস্তুত করে' বসে' আছে তার কোন রকম অপ্রকৃতিস্থ হবার কারণ ঘটে না। তাই আমি সেদিন চঞ্চলাকে নিরীক্ষণ করতে লাগলুম। দেখলুম চঞ্চলার সঙ্গে রেবামিনির সাদৃশ্য আমার উন্মাদ দৃষ্টির ভ্রান্তি একটুও নয়। সেই একই দাঁড়াবার ভঙ্গী, একই দেহের গঠন, একই উচ্চতা—সেই সবই এক। সেদিন চঞ্চলা একখানা হাল্‌কা সবুজ রঙের সাড়ী পরেছিল। বুঝলুম চঞ্চলার রেবামিনির সাদৃশ্যের কারণ আর যাই হোক্ না কেন তা সাড়ীর রঙের সাদৃশ্য নয়। এ সাদৃশ্য হয় চঞ্চলার দেহে, নয় আমার মনে।

চঞ্চলা দাঁড়িয়েই রইল। আমি ভীষণ অসোয়াস্তি বোধ করতে লাগলুম। আমি যে কি করব, আমার যে কি করা উচিত, সেটা আমি কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছিলুম না। আমি যে অপরাধী, এ সত্য আমার মনের কাছে অতি স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছিল। গত রজনীর ঘটনার যে কোন কৈফিয়ত নেই কিম্বা থাকলেও সে কৈফিয়তটা যে আর যাকেই হোক্ চঞ্চলাকে দেবার মতো নয়, সেটা আমি জানতুম। যা হোক্ ও রকম অবস্থাটা যখন বেজায় অসহ্য হ'য়ে উঠল, তখন আমি নিতান্তই খাপছাড়া ভাবে বললুম—"চঞ্চলা এসো"।

চঞ্চলা অগ্রসর হ'ল, ধীরে ধীরে সঙ্কোচের সঙ্গে দ্বিধাজড়িত পদে। এ দ্বিধা নব-বধূর প্রথম সম্ভাষণের লজ্জা-প্রসূত নয়, এ দ্বিধা উদ্ভূত হয়েছিল তরুণ মনে আশাভঙ্গের যে নিষ্ঠুর আঘাত, সেই আঘাত থেকে।

আমি কিন্তু চঞ্চলার চলনটাই দেখতে লাগলুম। সে-চলা একেবারে হুবহু রেবামিনির চলনের মতো। রেবামিনি মৃত, একথা আমি যদি

না জানতুম তবে আমি হল্‌ফ করে' বলতে পারতুম যে, এ মিনি—মিনি—মিনি ছাড়া আর কেউ নয়।

চঞ্চলা আমার কাছে এসে দাঁড়ালে আমি তার মাথার অবগুণ্ঠন ফেলে দিলুম। না, সকল সাদৃশ্য সত্ত্বেও এ রেবামিনি নয়। চঞ্চলা আমার দিকে তাকিয়ে দেখল, আমিও তার চোখের দিকে তাকিয়ে দেখলুম, বড় বড় কালো কালো-চোখ দুটি থেকে—উঃ সে কি দৃষ্টি! আমার মনে হ'ল কে যেন আমার হৃদ্‌পিণ্ডের দল্‌দলে তাজা রক্তমাংসের উপরে শঙ্কর মাছের লেজের চাবুক শপাং করে' বসিয়ে দিলে।

চঞ্চলার সে দৃষ্টি—সে-দৃষ্টিতে ভাষা ছিল, মিনতি ছিল, ছিল একটা জীবনের প্রাণপণে দাবিয়ে-রাখা ক্রন্দন—যে জীবনের সুখের একই মাত্র আশালতা, যে আশালতা ছিঁড়লে জীবনে আর কিছু ধরবার থাকে না। আমি অনুভব করলুম জল্লাদের সঙ্গে আমার কোনই প্রভেদ নেই। আমার ত কোন কৈফিয়ত নেই। আমি চঞ্চলাকে পাশে বসিয়ে আদর করতে লাগলুম। চঞ্চলার চোখ দু'টো ছল ছল করে' উঠল।

চঞ্চলার যে-হাতখানি নিয়ে আমি আদর করছিলুম সেই হাতখানার প্রতি আমার দৃষ্টি পড়ল—আমি চম্‌কে উঠলুম। রেবামিনির হাতের প্রত্যেক রেখাটি আমার চেনা। দেখলুম এ হাত ঠিক রেবার হাত। হাতের গড়ন, আঙুলের গড়ন, নখ সব অবিকল রেবামিনির হাতের মতো। চঞ্চলার বাঁ-হাতখানি নিয়ে তা উল্‌টিয়ে দেখলুম তার পিঠে অনামিকা আঙুলের উপরে তিলটি পর্য্যন্ত স্বস্থান ভ্রষ্ট নয়। আমি বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে হাত দু'খানির দিকে চেয়ে রইলুম।

চঞ্চলা অতি মৃদু কণ্ঠে সঙ্কোচের সঙ্গে বললে—"কি দেখছ?" চঞ্চলাকে আমি উত্তরে ফাঁকি দিলুম। আমি বললুম—"আমার স্বভাব এমনি যে, আমার মানুষের হাতের সঙ্গেই ভালবাসা আগে হয়। তোমার হাত দুখানি অতি সুন্দর।" চঞ্চলার চোখ দুটো উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল, তার ঠোঁট দু'খানিতে একটু মৃদু হাসির রেখা অঙ্কিত হ'তে চেয়ে চেয়ে মিলিয়ে গেল; কারণ তার প্রাণ থেকে শঙ্কা বুঝি তখনও একেবারে অন্তর্হিত হয় নি। কিন্তু সে দিন সে রাত্রে আমার অন্তরে সব চাইতে যেটা গভীর দাগ কেটেছিল সেটা হচ্ছে আমার পানে চঞ্চলার প্রথম দৃষ্টি-টি। আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলুম, আমার অন্তরে যাই হোক্ না কেন চঞ্চলার যেন দুঃখের কারণ আমি না হই। চঞ্চলাকে সুখী করবার জন্যে আমি প্রাণপণে চেষ্টা করব।

স্বর্ণ তার শ্বশুর বাড়ী চলে' গেল, আমরা স্বামী স্ত্রীতে যেমন সবাই দিন কাটায় তেমনি দিন কাটাতে লাগলুম। কিন্তু যতই দিন যেতে লাগল ততই আমার মনে একটা ভাব স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হ'য়ে উঠতে লাগল। সে ভাবকে আমি যতই ছাড়াতে চাই সে ভাব আমাকে ততই জড়িয়ে ধরতে লাগল। আমার সুখ সোয়াস্তি কোথায় উড়ে গেল। আমার ভিতর ও বাহির একটা বিরাট মিথ্যা সম্বন্ধের উপরে প্রতিষ্ঠিত হ'ল। এ মিথ্যা আমার চাইতে শক্তিমান। এ মিথ্যার হাত থেকে হায় আমার উদ্ধারের আর বুঝি উপায় নেই।

পলে পলে তিলে তিলে আমার মনে প্রাণে যেন আমার প্রত্যেক স্নায়ুতে স্নায়ুতে অতীতের একটি রহস্যময় অতি সূক্ষ্ম প্রভাব বিছিয়ে পড়তে লাগল যে প্রভাবের সামনে চঞ্চলার আস্তত্ব, চঞ্চলার স্বাতন্ত্র্য,

আমার কাছে প্রতিদিনে অস্পষ্ট থেকে অস্পষ্টতর হয়ে উঠতে লাগল। ঐ প্রভাবের মধ্যে আমার সুখ ছিল, বেদনা ছিল, আমার বিদ্রোহ ছিল আবার আনন্দও ছিল। অতীতের অস্পষ্টতার কাছেই বর্ত্তমানের স্পষ্টতা প্রতি নিমেষে হার মানতে লাগল।

আমি আদর করতুম—কাকে? চঞ্চলাকে? না—সে আদর যেন কোন্ অদৃশ্য লোকের কোন অদৃশ্য-শরীরী জীব এসে দাবী করে' কুড়িয়ে নিয়ে যেত, সে আদর চঞ্চলার শরীরের উপরেই থেকে যেত—তার অন্তরে ত পৌঁছিত না, সে আদর করবার সময় ত আমার চঞ্চলাকে মোটেই মনে পড়ত না—মনে পড়ত রেবামিনিকে, তার প্রতিদিনের কথাগুলিকে, তার বিশেষ বিশেষ দিনের অভিমান-গুলিকে; তার সোহাগ আদর হাস্য পরিহাস, এই সব একত্র হ'য়ে দল বেঁধে এসে আমার মনের উপরে পড়ে' সেখান থেকে অতি স্পষ্ট অতি বর্ত্তমান চঞ্চলাকে কোথায় নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রাখত—ঠিক আমি যখন চঞ্চলাকে নিয়ে আদর করতে বসতুম। হায়! এর বিরুদ্ধে আমি কেমন করে' লড়াই করব।

কিন্তু আর যাকেই হোক্ না কেন বাইরের মিথ্যা আচরণ দিয়ে আপনার জনকে চিরকাল ফাঁকি দেওয়া যায় না। যে দুটি মানুষ চব্বিশ ঘণ্টা এক বাড়ীতে রয়েছে, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কুড়ি ঘণ্টাই হয়ত যাদের বাক্য দৃষ্টি স্পর্শ পরস্পরের মধ্যে বিনিময় হচ্ছে, বিশেষত যে দুজনের অন্তত একজনও আর একজনের অতি আপনার অতি অন্তরতম হবার জন্যে ব্যগ্র—এমন যে দুটি মানুষ—এদের পরস্পরের মনের সঙ্গে এমনি একটা সম্বন্ধ স্থাপিত হ'য়ে যায় যাতে করে' সে দুটো মন বাইরের মিথ্যা আচরণে কিছুতেই প্রতারিত হয়

না। বাইরের সকল অনুষ্ঠানকে কাটিয়ে এদের এক জনের মনে প্রতিফলিত হয়ে যায়।

তাই চঞ্চলা এটা স্পষ্ট করে' না জানলেও এ অনুভবটা বোধ করতে তার বিশেষ বিলম্ব হ'ল না যে, আমার অন্তরাত্মা তার অন্তরাত্মাকে মোটেই বরণ করে' নিতে পারে নি, একান্ত সামীপ্য সত্ত্বেও আমাদের দু'জনের মধ্যে এমন একটা বাধা এমন একটা ব্যবধান আছে যা কি করলে ভাঙ্গে কি করলে ঘোচে তা তারও জানা ছিল না—আমারও জানা ছিল না, আর তা ভাঙ্গবার আমার ইচ্ছাও ছিল না—শক্তিও ছিল না।

ধীরে ধীরে চঞ্চলা সম্বন্ধে আমার মনে দুটো ভাব বাসা বাঁধল, দুটো পরস্পরের ঘোর বিরোধী! একটা তার প্রতি প্রবল আকর্ষণ, আর একটা তার বিরুদ্ধে ঠিক তেমনি প্রবল বিদ্রোহ। চঞ্চলার যেটুকু মিনির মতো, তার দেহের ভঙ্গিটি, তার হাত দুখানি—তাই ছিল আমার প্রতিদিনের সম্বল। তার দুখানি হাত আমি যখন ধরে' থাকতুম, তখন কি একটা মাদকতায় আমার চিত্ত মন ভরে' উঠত, কি একটা স্বপ্নে আমার সমস্ত বর্ত্তমান মুছে যেত, রেবামিনির চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে যেন তার একটা সূক্ষ্ম সান্নিধ্য আমি বোধ করতুম—আর সেই সময় একটা গভীর শান্তিময় তৃপ্তিতে আমার অন্তরাত্মা পূর্ণ হ'য়ে উঠত, যেন এ জগতে আর আমার কিছুই করবার বাকি নেই, ভগবানের দেওয়া এই জীবনের সকল ঋণই যেন আমার শোধ হ'য়ে গেছে, জীবনের শেষ কথাটি যেন আমার বলা হ'য়ে গেছে। কিন্তু যখন চঞ্চলার মুখের দিকে আমার নজর পড়ত, তখন আমার সে স্বপ্নের জগত মুহূর্ত্তে কোথায় মিলিয়ে গিয়ে তার বিরাট অমৃতত্ব

আমায় দেখিয়ে দিত। ঐ মুখখানাই ত যত নষ্টের মূল। হায়! ঐ মুখখানা যদি মিনির হ'ত! ধীরে ধীরে চঞ্চলার মুখের প্রতি একটা অতি রুদ্র অবজ্ঞা আমার মনকে প্রাণকে চিত্তকে বিষময় করে' তুলল। চঞ্চলাকে আমি ছাড়তে পারতুম না—কিন্তু সে ত চঞ্চলার জন্যে নয়।

কিন্তু আমার ঐ মনের ভাব চঞ্চলার মনে গিয়ে আঘাত করতে কিছুমাত্র দেরী করল না। চঞ্চলা আর আমার কাছে অবগুণ্ঠন উন্মোচন করতে চাইত না। আমিও তা কোনদিন খুলতে বলতুম না বা খুলতুম না। কোন অধিকারে?—এমনি করে' দিনের পর রাত, রাতের পর দিন কেটে যেতে লাগল, সদা-অবগুণ্ঠনবতী চঞ্চলাকে দেখে আমার বুকের মধ্যে মাঝে মাঝে একটা বিদ্যুতের ঝলক উঠত—এ চঞ্চলা? না রেবামিনি?—

আপনাদের মনে কোনদিন বিদ্রোহের ভাব জেগেছে? বিদ্রোহ—সংসারের উপরে সৃষ্টির উপরে ভগবানের উপরে। যেন এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে কিছুই ঠিক চলছে না—এর আগা থেকে গোড়া পর্য্যন্ত সব উল্টো, এর সুরু থেকে শেষ পর্য্যন্ত কেবল একটা বিশৃঙ্খলার জটলা। এখানে কারো বুদ্ধি নেই, বিবেচনা নেই, হৃদয় নেই, দয়া নেই, করুণা নেই, কিছুই নেই—আছে কেবল নিষ্ঠুর মরুভূমির ধূ ধূ ধূসর তপ্ত বালির চোখজ্বালা-করা শুভ্রতা। কিন্তু কেন? কারণ ঐ যে প্রশ্ন—এ চঞ্চলা, না রেবামিনি? এর উত্তর একটা বিরাট মিথ্যা।

আমার প্রতিদিনের নিষ্ঠুর অত্যাচার তার অন্তরাত্মার বিরাট অপমান সম্বল করে' চঞ্চলা শুকিয়ে উঠতে লাগল। এ থেকে বুঝি তার মুক্তি নেই, সে মন্ত্রমুগ্ধ বিহঙ্গিনীর মতো ধীরে ধীরে বুঝি মরণের দিকে অগ্রসর হ'য়ে চলল, আর সেই সঙ্গে মিনির জন্যে আমার

রাক্ষসী আকাঙ্ক্ষা প্রবল হ'য়ে উঠতে লাগল। এই রাক্ষসী আকাঙ্ক্ষার কতকটা তৃপ্তির জন্য আমার ছিল দরকার চঞ্চলাকে। ক্রমে ক্রমে আমার মনের দ্বিধা দ্বন্দ্ব সব ঘুচে গেল, চঞ্চলা যে একটি জীব, তার যে একটা পৃথক জীবন আছে, যে জীবনে সুখ দুঃখ বোধ আছে, আশা আকাঙ্ক্ষা আছে, তা আমি ভুলে গেলুম। চঞ্চলার দিনগুলো একটা অন্তহীন দুঃখের ভিতর দিয়ে ব'য়ে যেতে লাগল। হায়! এর থেকে তার মুক্তি কিসে হবে? কবে হবে?—

এমনি করেই দিন কাটতে লাগল। একদিন রাত্রে মিনিকে ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়লুম। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছিলুম যে, মিনি আমার বিছানার পাশে এসে হেসে কুটি কুটি হ'য়ে আমায় বলছে—"এই দেখ আমি আবার এসেছি, তুমি কি ঘুমিয়েই থাকবে?" আমার ঘুম তখনই ভেঙ্গে গেল। দেখলুম কেবল অন্ধকার, আর আমার পাশে একটা অতি মৃদু কান্নার শব্দ। চঞ্চলা কাঁদছিল।

হায়! আমি চঞ্চলাকে কি বলে' সান্ত্বনা দেব। সে যে হবে ঘোর মিথ্যা। আমার মুখের কথা কি তার প্রাণে লাগবে। আমার অন্তরাত্মায় যার চিহ্নমাত্র নেই, তারি ফাঁকা মুখের কথায় কি তার অন্তরাত্মায় শান্তি ঢেলে দেবে? আমি জানতুম তা দেবে না। তাই আমি কিছুই বলতে পারলুম না। কি জানি কত রাত চঞ্চলা এই রকম কেঁদে কাটিয়েছে!

এমন সময় মা আমার কবাটে আঘাত করে' ডাকলেন। আমি জেগেই ছিলুম, উত্তর দিলে মা বললেন—"দেখত কার মোটর এসে আমাদের বাড়ীর গেটের কাছে এসে লাগল।"

মোটরের শব্দটা আমারও কানে এসে লেগেছিল কিন্তু আমি সে-দিকে তত মনোযোগ দিই নি। যখন মা বললেন যে, সেটা আমাদেরই বাড়ীর গেটের কাছে এসে লেগেছে' তখন আমি তাতাতাড়ি বিছানা ছেড়ে উঠে বেরিয়ে পড়লুম।

বাইরে গিয়ে দেখলুম আমার শ্বশুর বাড়ীর—চঞ্চলার বাপের বাড়ীর—মোটর, সোফরের হাতে এক চিঠি। চিঠি পড়ে' জানলুম যে চঞ্চলার বাবা অত্যন্ত পীড়িত, এখন যায় যায় অবস্থা, ডাক্তারের মতে আজ রাত কাটে কি না সন্দেহ, চঞ্চলাকে দেখবার জন্যে তিনি ব্যাকুল, কেবলই চঞ্চলাকে ডাকছেন, চঞ্চলাকে ফিরতী মোটরে পাঠাবার ব্যবস্থা করবার জরুরি অনুরোধ।

আমি তাড়াতাড়ি মা'কে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিয়ে, চঞ্চলার গায়ে একটা শাল জড়িয়ে দিয়ে দু'জনে গিয়ে মোটরে চড়লুম। মোটর ঝড়ের বেগে ছুটে চলল।

ভোর হয় হয়—হ্যারিসন রোডের গ্যাসের বাতিগুলো কেবল নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমাদের মোটর আমর্হাষ্ট ষ্ট্রীটে চঞ্চলার বাপের বাড়ীর সামনে গিয়ে লাগল। মোটর থামার সঙ্গে সঙ্গে আমার শ্যালক অমূল্য এসে চঞ্চলাকে নিয়ে গেল, আমি বৈঠকখানায় অপেক্ষা করতে লাগলুম।

পাঁচ মিনিটও হয় নি, তখন উপরে বাড়ীর ভিতরে একটা চাঞ্চল্যের আভাস পেলুম। সঙ্গে সঙ্গে অমূল্যের উত্তেজিত কণ্ঠ আমাকে ডাকলে—"বিভূতি বাবু, বিভূতি বাবু, একবার উপরে আসুন"। আমি তাড়াতাড়ি উপরে উঠে গেলুম।

যে ঘরে রোগী ছিল সেই ঘরে গিয়ে প্রবেশ করলুম, দেখলুম চঞ্চলা অবগুণ্ঠন-হীনা রোগীর শয্যার পাশে নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে। রোগী বিছানার উপরে উঠে বসেছে। তার জীর্ণ মুখমণ্ডলে কোটরগত চোখ-দুটো কেবল যেন কোন অদৃশ্যলোকের তীব্র ও তীক্ষ্ণ আলোকের সম্পাতে জ্বল্ জ্বল্ করছে। আমি ঢুকতেই রোগী হতাশ কণ্ঠে বললেন, "এ কাকে নিয়ে এলে বাবা, এ ত আমার চঞ্চলা নয়।"

আমি আমার স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে দেখলুম—ওঃ কি দেখলুম !!!

মুহূর্ত্তে—বোধ হয় এক সেকেণ্ডের সহস্রাংশের এক অংশ সময়ের জন্যে আমার ধমনীতে ধমনীতে সমস্ত রক্ত চলাচল বন্ধ হ'য়ে গেল, তার পর-মুহূর্ত্তে সেই রক্ত-প্রবাহ আবার আমার সর্ব্বাঙ্গে ছেয়ে গিয়ে আমাকে উন্মাদের মতো করে' তুলল, ক্ষুধার্ত্ত শার্দ্দূলের মতো আমি চক্ষের পলকে গিয়ে আমার স্ত্রীকে আমার বুকের উপরে চেপে ধরলুম। কি একটা বিজয়-গর্ব্বে আমার সমস্ত অন্তর উথলে-ওঠা সাগর-বারির মতো স্ফীত হয়ে উঠল, আমি রোগীর দিকে চেয়ে এক হাত তুলে যেন আমার সম্মুখীন মৃত্যুর অসীম শক্তিকে লক্ষ্য করে' চ্যালেঞ্জের স্বরে চেঁচিয়ে বলে' উঠলুম—না এ আপনার মেয়ে চঞ্চলা নয়—এ আমার স্ত্রী রেবামিনি"।

মরণাহত রোগী বিছানার উপরে ঢলে পড়ল। আমি সে দিন আমার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীকে প্রথম চুম্বন করলুম।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

সামাজিক সাহিত্য।

—:※:—

কোনো এক সময়ে হবুচন্দ্র রাজার রাজধানীতে অত্যন্ত সন্দেহ জনক অবস্থায় দুটি লোক গ্রেপ্তার হয়েছিল। তারা নাকি দিনে দুপুরে রাজা এবং মন্ত্রী দু'জনার চোখের সামনেই রাজবাড়ীর পুরাতন পুকুরটি চুরি করবার মৎলবে সিঁদ কাটছিল! যা হোক, শেষ পর্য্যন্ত হবু-গবুর সতর্কতায় সে সব ফেঁসে গিয়েছিল;—এবং যা ঘটেছিল তা অভিজ্ঞ পাঠকের অগোচর নেই।

বর্ত্তমানে আমাদের বাঙলা-সাহিত্যের আসরেও নাকি ঠিক অম্নি-ধারা একদল সিঁদেলের আবির্ভাব হয়েছে। তাদের লক্ষ্য নাকি আমাদের 'সনাতন সমাজ'; কথাটা আশঙ্কা-জনক সন্দেহ নেই, তবে ভরসা এই যে, এ ক্ষেত্রেও হবু-গবু যথেষ্ট বিনিদ্র এবং আশানুরূপ সতর্ক। হবু-গবুর এই বনিয়াদি সতর্কতা আর অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার ফলে কিছু দিন থেকে আমাদের বঙ্গ-সাহিত্য শনৈঃ শনৈঃ আমাদের সমাজের স্বেচ্ছা-সেবক সম্প্রদায়ের লীলাক্ষেত্রে পরিণত হ'তে চলেছে। এখন সাহিত্য-সেবকগণের লক্ষ্য হয়েছে সমাজ-সংস্কার, আর সমাজ-পতি মহাশয়দের কাজ হয়েছে সাহিত্য-সমালোচনা।

সাহিত্য আর সমাজের একটা সহজ সমাহার খুব স্বাভাবিক এবং বাঞ্ছনীয়; কিন্তু দৈব-দুর্ব্বিপাকে যখন উক্ত সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনীভূত এবং ব্যতীহার অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে তখন আবার নতুন করে

সাহিত্যের উদ্দেশ্য নির্ণয় আর সমাজের চৌহদ্দি নির্দ্দেশ নিতান্তই আবশ্যক।—নতুবা অদূর ভবিষ্যতে উভয়েরই শ্রীহীন হয়ে পড়বার বিলক্ষণ সম্ভাবনা।

সাহিত্য-সমালোচনার সময় আমরা প্রায়ই ভুলে যাই যে, ও-বস্তু সমাজ-কোষে উপ্ত এবং অঙ্কুরিত হ'লেও ওর ফুল এবং ফল আকাশেই ফুটে থাকে।—তথাকথিত সমাজের মাটী আঁকড়ে যার মন পড়ে আছে, সাহিত্যের সুতার এবং সুগন্ধ থেকে সে যে চিরদিনই বঞ্চিত থাকবে! বেল পাকলে কাকের কি? তবুও যে যখন তখন সমাজের তরফ থেকে সাহিত্যের উদ্দেশে লোষ্ট্র-বর্ষণ হয়ে থাকে তাতে ত আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই। অম্নি করেই ত ইতর প্রাণী থেকে মানুষের শ্রেষ্ঠতা অহরহ প্রতিপন্ন হচ্ছে। না-মরে ভূত হবার শক্তি ত ঈশ্বর আর কোন জানোয়ারকেই দেন নি। ও-যে জীবশ্রেষ্ঠ মানুষেরই সামাজিক উত্তরাধিকার!—আশার চাইতে মানুষের আশঙ্কাই বেশি। এই আশঙ্কার বশে অভিভূত হয়েই ত সাহিত্যের ফুলের ঘায়ে আমাদের মূর্চ্ছার উপক্রম হয়; আর এই আশঙ্কার উদ্বেগে উত্তেজিত হয়েই ত প্রতি মুহূর্ত্তে কাঁচা-সাহিত্যের ডাঁসা-ফলের আকস্মিক পতনে সমাজের অপঘাত সম্ভাবনায় আমরা অধীর হ'য়ে উঠি!

আশঙ্কায় দিশে-হারা হয়ে আমরা ভুলে যাই যে, জনগণের ঐকান্তিক মানস ছাড়া সাহিত্যের ফলে পাক ধরে না; আর, সমাজের আন্তরিক আহ্বান ছাড়া সাহিত্যের ফল ভূমি স্পর্শ করে না। বঙ্কিম চন্দ্রের "বন্দেমাতরম্" বাঙালীর অন্তর স্পর্শ করেছে, তাঁর পরলোক-গমনেরও বহুবর্ষ পরে। আর, বলাই বাহুল্য যে, 'বসুমতী'র সুলভ

সংস্করণের বহুল প্রচার তার কারণ নয়। কালের আবর্ত্তনে বাঙালী যখন বহুবর্ষ সঞ্চিত জড়তা দূরে ফেলে দিয়ে, নূতন আশার আলোকে স্নাত পুলকিত হয়ে, নূতন ব্রতে দীক্ষিত হবার আশায় উৎসুক উন্মুখ উদগ্র হয়ে উঠেছিল, তখনই ত তারা নতুন করে ঋষিরূপে বঙ্কিমচন্দ্রকে আবিষ্কার করতে পেরেছিল।—তখনই ত দেশব্রতের বীজ-মন্ত্র "বন্দেমাতরম্" ভূমিষ্ঠ হ'য়েছিল।

এ কথা যে কেবল বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধেই খাটে, তা নয়। রাজা রামমোহন থেকে আরম্ভ করে' স্বামী বিবেকানন্দ পর্য্যন্ত সবাইকেই আমরা আজ নবতর ভাবে পেয়েছি। আমাদের মনের কোণে সনাতন জড়তার ধূলায় অবলুণ্ঠিত হয়ে যে অনাদৃত সপ্তস্বরা পড়ে' ছিল, কালের টানে তার তারে তারে যে আজ সুর যোজনা হয়ে গেছে, তাই না তাঁদের মনের অনুরণন, তাঁদের বাণীর প্রতিধ্বনি আজ আমাদের কাছে এত সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

এম্নি করে চিরদিনই সমাজ সাহিত্য থেকে প্রয়োজন এবং প্রয়াস অনুযায়ী ভাব আহরণ করে আপনাকে সুস্থ পুষ্ট এবং বলিষ্ঠ করেছে। কিন্তু তাই বলে কি সমাজের প্রয়োজন খুঁটিয়ে, সমাজের বায়নায়, সমাজের তাগিদে কখনো সাহিত্য গড়ে উঠেছে? আমার বিশ্বাস এমন ধারা "সামাজিক-সাহিত্য" গড়বার চেষ্টা নিতান্তই পণ্ডশ্রম। পাখার বাতাসে নৌকার পালে হাওয়া লাগে না, তার জন্যে চাই স্বভাব-দত্ত মুক্তপবন। প্রতিভার দিব্য দৃষ্টির সাহায্যে আত্ম-সমাহিত সাহিত্যিক যে কল্পলোকের সৃষ্টি করেন বর্ত্তমানের বস্তুতন্ত্রতার মাপ কাটিতে তা যতই কেন নিরর্থক প্রমাণিত হোক না, ভবিষ্য-সমাজের সেই হবে পাথেয়।

(২)

সমসাময়িক সমাজের পথ্য হিসাবে বর্ত্তমান সাহিত্যকে বিচার এবং প্রচার করবার মত ভুল আর কিছুই হ'তে পারে না। সাহিত্য-আলোচনায় সেই ভুল আমরা নিয়ত কর্চ্ছি। রুগ্ন সমাজের দুর্ব্বল পাকস্থলীর দিকে দৃষ্টি রেখে কখনো আমরা তার জন্যে রুটির ব্যবস্থা কর্চ্ছি, কখনো আবার তার আশু বলাধানের জন্যে অথবা তার রুচি পরিবর্ত্তন কল্লে লুচি সাধছি। সমাজ শরীরের 'পরে আমাদের এ সব সাহিত্যিক পরীক্ষা যে খুব কার্য্যকরী হচ্ছে এমনটি সন্দেহ করবার কোনো হেতু ত আমাদের চোখে পড়ে না। আমাদের বিশ্বাস, সমাজ সম্বন্ধে অতটা সচেতন হয়ে যা রচনা করা যায়, তা সাময়িক সামাজিক সন্দর্ভ হতে পারে, কিন্তু স্থায়ী সাহিত্যের পদগৌরব তার ভাগ্যে জোটে না।

এ কথার প্রতিবাদ স্বরূপ বাঙলা ইংরাজী নানা দেশীয় নানা সাহিত্য মন্থন করে অনেক নজিরই অনেকে হয়ত এনে হাজির করতে পারেন। কিন্তু সে সকলের সঙ্গে আমার তথাকথিত "সামাজিক-সাহিত্যের" বিস্তর প্রভেদ! চাঁদের আলোর সাথে চাঁদির ঔজ্জ্বল্যের কি কোনো সাদৃশ্য সম্ভব? প্রতিভাশালী সাহিত্য-রসিক চরিত্র সৃষ্টির পারিপার্শ্বিক হিসেবে যখন সমাজ-চিত্র অঙ্কনে প্রবৃত্ত হন, তখন তাঁর বিশ্লেষণের পরদায় পরদায় তাঁর নিজেরও অজ্ঞাতে একটা অনায়ত্তের আভাস, একটা অনাগতের আহ্বান, একটা নবতর বিধানের ইঙ্গিত, স্বতই পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। এই যে স্বাভাবিক সত্যানুভূতি এবং তাহার অতীব সহজ বিকাশ, এই হচ্ছে সাহিত্যের প্রাণ; এই হচ্ছে তার চাঁদের আলো!

সমালোচ্য সামাজিক-সাহিত্যে এই বস্তুটির একান্তই অভাব।

দেশটা অত্যন্ত রকমের স্বাত্বিক ভাবাপন্ন বলেই হয়ত অনেকে এই প্রাণবিহীনতাটাকে গাম্ভীর্য্য বলে' ধরে নিয়ে যথারীতি এবং যথাস্থানে পূজা এবং দক্ষিণাদি দিয়ে থাকেন! এইজন্যেই হয়ত "দৈনিকে" যার আলোচনা হওয়া উচিত, আমরা "মাসিকে" তার সম্বর্দ্ধনা করি; আর "মাসিকে" যা চুকে গেলেই হ'ত, আমরা আবার তার আট আনা, এক টাকা, পাঁচসিকা, সাতসিকা সংস্করণে ঘর আলো করি। এম্নি করে আমাদের সাহিত্যের ধারের চেয়ে তার ভার ক্রমশই বেড়ে চলেছে। ওষুধের নামে খোঁজ নেই, অনুপানের হাঙ্গামায় অস্থির।

(৩)

নৌকয় বসে বসে গুণের দড়াদড়ি ধরে প্রাণপণ টানাটানি করলেও নৌকার গতিশীল হবার কোনো সম্ভাবনাই নেই!—আছে মাস্তুল এবং গুণের গতাসু হবার পরিপূর্ণ আশঙ্কা। সাহিত্যিক যদি নিজের মনকে সমাজের অতীত অনধিগত সুরে বেঁধে নিতে না পারেন তবে সাহিত্যের শিব গড়তে না যাওয়াই তাঁর পক্ষে বিধেয়। কারণ তাতে করে' খুব সম্ভব সমাজের কল্যাণ হবে; কিন্তু সাহিত্যের অবমাননা হবেই।

মনুষ্য-সভ্যতার চরম পরিণতি, আর তার বিকাশের স্বাভাবিক ধারা সাহিত্যিকের চক্ষে যে আকারে প্রতিভাত হবে, সেই হবে তাঁর সমাজ। তাঁর সমস্ত সামাজিক প্রবৃত্তি এবং প্রবণতা, নতি এবং রুচির ঝোঁক হবে সেই দিকে। তার চেয়ে ছোটো, তার চেয়ে সঙ্কীর্ণ কোন সমাজের বিধি নিষেধ তাঁর মনেই আসবে না—সাহিত্য-

সেবার সমাহিত অবস্থায়। সমাজের দোষগুণ সম্বন্ধে সাহিত্য-সেবী অজ্ঞ থাকবেন এমন কথা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, আমরা কেবল চাই—ও সবেতে তিনি থাকবেন সম্পূর্ণ অনাচ্ছন্ন।

সাহিত্যিকের প্রতিভা যদি সুস্থ এবং অবিকৃত থাকে তবে তাঁর রচনা, তাঁর সৃষ্টি সামাজিক পাপ এবং মিথ্যাকে স্বভাবতই তিরস্কৃত করবে। সে জন্যে তাঁর দিক থেকে অধিকন্তু কোনো চেষ্টার আর সমাজের তরফ থেকে উদ্দীপনা বা উৎসাহের কোনো প্রয়োজনই হবে না। সৃষ্টির আনন্দ আর প্রকাশের উত্তেজনাই হবে সাহিত্যের চিরন্তন প্রেরণা। তার চেয়ে সঙ্কীর্ণতর কোনো উদ্দেশ্যেই লেখকের সাহিত্য-প্রতিভাকে নিঃশেষে উৎসারিত করতে পারবে না।

সাহিত্য থেকে দেশ-কালোপযোগী ভাব এবং শক্তি-সংগ্রহ করা সমাজের পক্ষে সর্ব্বতোভাবেই কর্ত্তব্য; কিন্তু সমাজের হিতকল্পে দেশ-কালোপযোগী সাহিত্যের আশা এবং আমদানীর চেষ্টা গাভীর বাঁটে দরকার-মাফিক দুধের পরিবর্ত্তে দই, ক্ষীর, ছানা, মাখনের প্রত্যাশার মতই অসঙ্গত। এবম্বিধ অসঙ্গত আশার বশবর্ত্তী হয়ে সাহিত্য-সমালোচনা প্রসঙ্গে আমরা কখনো হতাশ, কখনো বা উত্তেজিত এবং নিতান্ত কদাচিত পরিতুষ্ট হয়ে থাকি।

দরকারের মূর্ত্তি এবং মাত্রা প্রত্যেকেরই আমাদের স্বতন্ত্র, কাজেই তার মাপকাটিতে সাহিত্য মেপে সন্তোষজনক কোনো সাধারণ-মীমাংসায় উপনীত হবার সম্ভাবনা নিতান্তই কম। আর, এ ক্ষেত্রে লেখক ও পাঠকের দরকারের দ্বন্দ্ব চিরদিনই থাকবে। অন্তত তার পরিপূর্ণ মিলন চন্দ্রগ্রহণ সূর্য্যগ্রহণের মতই সাম্বাৎসরিক এবং স্মরণীয় ব্যাপার বলে পরিগণিত হবে!

কিন্তু তা' ত নয়! পাঠকের সর্ব্বাঙ্গীন সহানুভূতি না পাওয়া হলে ত সাহিত্যিকের সাধনাই নিষ্ফল! দরকার অদরকারের খোসা-ভূষি দূরে ফেলে লেখকের অন্তরতম মানুষটি যখন পাঠকের কাছে এসে সমপ্রণতার দাবী করে' হাত বাড়িয়ে দেয়, কেবল তখনই না সব সংস্কারের অভিমান ভুলে গিয়ে, সব সমাজ এবং সম্প্রদায়ের জাল ভেদ করে পাঠক তার আলিঙ্গনে আত্মসমর্পণ করে!

মানুষে মানুষে প্রকৃতিগত যে মৌলিক মিল, সেইটেই হচ্ছে আমাদের মনুষ্যত্ব। সাহিত্যের যত আবেদন এবং আমন্ত্রণ সবই তার কাছে। সমাজ আর সামাজিক বিধি নিষেধ হয়েছে, তার ধড়া-চূড়া এবং চাপরাশ। দেশ এবং কালভেদে ওদের রং এবং ঢং-এর বিস্তর তারতম্য হয়ে থাকে। উক্ত ধড়া-চূড়ার রিপুকর্ম্ম অথবা চাপরাশের পিতলের পরিমার্জ্জনা সাহিত্যিকের কাজ নয়। মনুষ্যত্বের রহস্যের 'পরেই হয়েছে সাহিত্যের সত্যিকার প্রতিষ্ঠান। মানুষকে সবদিক দিয়ে তার মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে সজাগ এবং সপ্রতিভ করাই সাহিত্যের লক্ষ্য। সাহিত্যকে সমাজের আশ্রিত অথবা সমাজের অভিমুখীন করবার চেষ্টা অনেকটা মুক্ত বিহঙ্গকে আবার ডিমের ভিতরে বসাবার আশার মতই বিপজ্জনক! মনুষ্যত্বের মুখচেয়ে এমন ধারা অমানুষিক প্রচেষ্টা থেকে নিবৃত্ত হওয়া আমাদের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

শ্রীবরদাচরণ গুপ্ত।

আর্য্যামি।

(১)

আমাদের আদিম আর্য্য প্রপিতামহেরা ধরাপৃষ্ঠের ঠিক কোন্ জায়গা থেকে যাত্রারম্ভ করে' যে পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়েছেন, সে প্রশ্নের একটা নিশ্চিত জবাব দেওয়া শক্ত। তাঁরা কি মধ্য-এশিয়ার পশ্চিম দিকটায় ভেড়া চরাতেন, না নরওয়ের উত্তর-মাথায় মাছ শীকার করতেন, এ তর্কের এখনও মীমাংসা হয় নি। ভাষাতত্ত্বের প্রমাণে যব তাঁরা সকলে মিলে নিঃসন্দেহই খেতেন, তবে তা তাঁদের চাষ করে'-পাওয়া, না ইউফ্রেটিসের তীরের বুনো যব, সে বিষয়েও মহা মতভেদ রয়েছে। তার পর তাঁদের সবারি মাথার প্রস্থের একশ গুণকে দৈর্ঘ্য দিয়ে ভাগ করলে ভাগফল যে কখনই পঁচাত্তরের বেশী হ'ত না, একথা আর এখন কোনও পণ্ডিতই হলপ নিয়ে বলতে রাজী নন। বরং শোনা যাচ্ছে যে, যেমন আমাদের বাঙালী ব্রাহ্মণেরা সবাই এক আর্য্যবংশাবতংস হ'লেও তাঁদের চেহারায় এ মিলটা ধরার জো নেই, কেননা কেউ কটা কেউ কৃষ্ণ, কারও মাথা গোল কারও চেপ্টা, তেমনি আদিম আর্য্যদের মধ্যেও চেহারার এই গরমিলের দিকেই প্রমাণের পাল্লাটা নাকি বেশি ভারী হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এমন কি একদল কালাপাহাড়ি পণ্ডিত এরি মধ্যে বলতে সুরু করেছেন যে, আর্য্য বলে' কোনও একটা বিশিষ্ট জাত, অর্থাৎ একটা বিশিষ্ট জাত যাকে ঐ এক নামে ডাকার কোনও বস্তুগত কারণ আছে, কোনও দিনই কোনও-

খানে ছিল না। ওটা একটা ভাষাতত্ত্ব ও নৃতত্ত্বের পণ্ডিতদের মানসিক সৃষ্টি, 'ওয়ার্কিং হাইপথিসিস্'।

যেমন গতিক দেখা যাচ্ছে, তাতে করে' প্রাচীন ও আদিম আর্য্য-জাতির অদৃষ্টে কি আছে বলা কঠিন। আসছে পঞ্চাশ বছরের মধ্যে তাঁরা বিধাতার সৃষ্টি বলে' কায়েম হয়েও বসতে পারেন, আবার মানুষের কল্পনা বলে' বাস্তব পদার্থের লিষ্টি থেকে তাঁদের নামও কাটা যেতে পারে। কিন্তু একটা বিষয়ে আমরা নিশ্চিন্ত থাকতে পারি। আর্য্য-জাতির কপালে যা-ই ঘটুক, তাঁরা বস্তু হ'য়ে চেপেই বসুন, আর অবস্তু হয়ে' উড়েই যান, 'আর্য্যামি' বস্তুটির তাতে বিশেষ কোনও ক্ষতি বৃদ্ধি হবে না। যারা মনে করে, কারণ না থাকলেই আর তার কার্য্য থাকে না, তারা না পড়েছে দর্শনশাস্ত্র, না আছে তাদের লৌকিক জ্ঞান। 'নিমিত্ত' কারণ যে একটা কারণ, একথা আরিষ্টটল্ থেকে অন্নভট্ট পর্য্যন্ত সবাই একবাক্যে স্বীকার করেছেন। এবং ও-কারণটি নিজে ধ্বংশ হ'লেও তার কার্য্য ধ্বংশ হয় না। যেমন নিজের বোনা কাপড়খানির পুর্ব্বেই তাঁতি বেচারীর জীবনান্ত ঘটতে কিছুই আটক নেই। আর পুঁথি ছেড়ে সংসারের দিকে চেয়ে দেখলেও এর ভূরি ভূরি প্রমাণ চোখে পড়বে। যুদ্ধ থেমে গেছে কিন্তু 'পাব্‌লিসিটি বোর্ড' চলছে; জর্ম্মাণ ভীতি ঘুচে গেল অথচ 'রিফর্ম্ম স্কীম' নিয়ে আমাদের তর্ক শেষ হয় নি; এমন কি বিলাতের কলের মজুরেরা যেমন যুদ্ধের মধ্যে দুবেলা পেটপুরে খেয়েছে, যুদ্ধের পরেও তেমনি চলুক বলে' হাঙ্গাম উপস্থিত করেছে।

কিন্তু প্রকৃত গোড়ার কথা এই যে, 'আর্য্যামির' সঙ্গে 'আর্য্যের' আসলে কোনও কার্য্যকারণ সম্বন্ধ নেই। আর্য্যজাতি পৃথিবীতে যতই

প্রাচীন হ'ন না কেন, 'আর্য্যামি' জিনিষটি যে মনুষ্য-সমাজে তার চেয়ে ঢের বেশি প্রাচীন, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ করা চলে না। ব্যুৎপত্তি দিয়ে বস্তুনির্ণয়ের চেষ্টা করে শুধু এক বৈয়াকরণ ; এবং ও-জাতটি যে কাণ্ডজ্ঞানহীন একথা সর্ব্ববাদীসম্মত। 'আর্য্যামি হ'ল মানুষের সেই মনোবৃত্তির প্রকাশ ও বিকাশ, বিলাতী পণ্ডিতদের মতে যাতে ইতর প্রাণী থেকে মানুষ তফাত, অর্থাৎ তার 'সেল্‌ফ্ কন্‌শাস্‌নেস্' ; আর দেশীতত্ত্বজ্ঞদের মতে যার সম্পূর্ণ বিনাশ, অথবা যা একই কথা—চরম বিকাশই হচ্ছে পরামুক্তির পথ, অর্থাৎ অহংজ্ঞান। সমাজতত্ত্ববেত্তারা বলেন, মানুষ যে পরের মধ্যে নিজের সাদৃশ্য দেখে, তাতেই সে অপরের সঙ্গে সমাজ বেঁধে ঘর করতে পারে। এই সাদৃশ্যবোধ হ'ল সমাজবন্ধনের একটা পোক্ত শিকল। কিন্তু সবাই জানে ভিন্ন জিনিষের মধ্যে সাদৃশ্যজ্ঞানটা সাধারণ বুদ্ধির কথা। সূক্ষ্মবুদ্ধির কাজ হচ্ছে একই রকম জিনিষের মধ্য থেকে তফাত বের করা। সুতরাং মানুষ যখন সূক্ষ্মবুদ্ধির জোরেই করে' খাচ্ছে, তখন তার বুদ্ধির স্বাভাবিক ঝোঁকটা হ'ল পরের সঙ্গে নিজের সাদৃশ্য নিয়ে খুসি না থেকে, এই মিলের মধ্যে অমিল কোন্ কোন্ জায়গায় তাই খুঁজে বের করার দিকে। আর এ খোঁজে কাকেও ব্যর্থ হ'তে হয় না। কেননা একে ত লাইবনিজ প্রমাণই করে' গেছেন যে, সংসারে দু'টি বস্তুর ঠিক এক রকম হবার কোনও জো-ই নেই ; আর লাইবনিজ ছিলেন একজন দিগ্‌গজ গণিতজ্ঞ লোক। তার পর সবাই নিজকে জানে সাক্ষাৎ ভাবে, অন্য সকলকে পরোক্ষে। আমার বুদ্ধি আমার কাছে স্বপ্রকাশ, অন্যের বুদ্ধি আছে কি নেই, সেটা অনুমানের কথা। কাজেই আমি যে অন্য সকলের চেয়েই ভিন্ন রকমের, এবং মোটের

উপর এ রকমটি আর হয় না, এ জ্ঞান যেমন ব্যাপক তেমনি গভীর। নিজের সম্বন্ধে এই মর্ম্মগত বোধটা লোকে যখন প্রকাশ করে' ফেলে, তখন তার নাম হয় 'অহঙ্কার', দ্বিতীয় ভাগ থেকে বেদান্তগ্রন্থ পর্য্যন্ত সবাই যার একটানা নিন্দা করেন। আর এ ভাবটি যখন একটা দলকে ধরে' প্রকাশ হয়, তখন সেই বস্তুটিই হ'ল 'আর্য্যামি'। কেবল দলের প্রকারভেদে নামের রকমভেদ ঘটে, যেমন আভিজাত্য, ব্রাহ্মণত্ব, পেট্রিয়টিজম্, অ্যাংলো-ম্যাক্‌সনত্ব ইত্যাদি। এবং ভাট, চারণ, কবি, ঐতিহাসিক সকলে মিলে মানুষের সভ্যতার সুরু থেকে আজ পর্য্যন্ত এর জয়গান গেয়ে আসছে।

সংসারে এমন সব সরলবুদ্ধির লোকও আছে যারা প্রশ্ন করে' বসে ব্যক্তির পক্ষে যেটা দোষের, সমাজ বা জাতি, অর্থাৎ ব্যক্তিসমষ্টির পক্ষে সেইটিরই বর্দ্ধিত সংস্করণ বা 'এন্‌লার্জড্ এডিশন্' কেন প্রসংশার?—অবশ্য এর সোজা উত্তর এই যে, ব্যক্তি আর জাতি এক নয়, কেননা যদি তা হ'ত, তা হ'লে ও-দুয়ের নাম এক না হ'য়ে, ভিন্ন ভিন্ন হবে কেন! উক্তরূপ প্রশ্নকর্ত্তাদের পাণ্ডিত্যের উপর বিশেষ শ্রদ্ধা নেই ; না হ'লে জর্ম্মাণ, অজর্ম্মাণ সব রকম পণ্ডিতের প্রাচীন নতুন নানা মত তুলে এ-ও দেখান যেত যে, জাতি বা 'ষ্টেট' জিনিষটা মোটেই ব্যক্তির সমষ্টি নয়। কেননা ও-নিজেই একটা স্বতন্ত্র ব্যক্তি, যার একটা নিজস্ব গুণ, ইচ্ছা, অনুভূতি আছে, যা জাতি বা ষ্টেটের লোকদের গুণ, ইচ্ছা ও অনুভূতি থেকে স্বতন্ত্র, মোটেই তার সমষ্টি নয়। অর্থাৎ দেশের সব লোক দরিদ্র হ'লেও দেশটা ধনী হতে কোন আটক নেই। আর এ কথা যে ঠিক, ভারতবর্ষের প্রত্যেক লোককেই তা স্বীকার করতে হবে। এই সব সূক্ষ্ম অথচ প্রকাণ্ড তত্ত্ব যাদের বুদ্ধির অগম্য তাদের জন্য

একটা সহজ ছোট উত্তর দেওয়া যাচ্ছে। কারু নিজের সম্বন্ধে অহঙ্কার প্রকাশ করাটা যে, সমাজে নিন্দার কথা, তার কারণ ঐ এক অহং-এর খোঁচা আর সকল অহং-এর গায়ে লেগে তাদের ব্যথিত করে' তোলে। কিন্তু একটা গোটা দলকে ধরে' যখন এটি প্রকাশ হয়, তখন দোষটা আর থাকে না। এবং এতে দলের সকলেরই সহানুভূতি পাওয়া যায়। অবশ্য এক দলের অহং বোধটা অন্য আর এক দলের গায়ে লাগেই লাগে। কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না। কেননা আমাদের যা কিছু রীতি, নীতি, বিধি, নিষেধ, সে সবি হ'ল ছোট হোক বড় হোক কোনও একটা দলের লোকদের পরস্পরের প্রতি ব্যবহারকে লক্ষ্য করে'। এক দলের সঙ্গে আর এক দলের ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রিত করা এ সব কোনও কিছুরই লক্ষ্য নয়। সেই জন্য লোকের সঙ্গে কথায় ও কাজে যে লোকের ভদ্রতার সীমা নেই, সেই লোকই একটা সমস্ত জাতির সম্বন্ধে কথায় বা ব্যবহারে কোনও রকম ভদ্রতা রক্ষার প্রয়োজন বোধ করে না। যে লোক জীবনে কাকেও কোনও দিন কড়া কথা বলে নি, সেও দল বেঁধে একটা গোটা দেশকে পেষণে ও শোষণে কিছুমাত্র দ্বিধা করে না।

আধুনিক য়ুরোপীয় রাজ্যগুলির মধ্যে "ইণ্টারন্যাশানাল ল" বলে' যে আপোষি ব্যবহারনীতির চলতি আছে, সকলেই জানে যে, তার গোড়ার কথা হচ্ছে সমাজে বা রাষ্ট্রে মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবহারের যে সব নিয়ম কানুন গড়ে' উঠেছে, রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের ব্যবহারে সেই গুলিকে চালিয়ে নেওয়ার চেষ্টা। ডাচ্ পণ্ডিত হ্যুগো গ্রোসিয়াস্‌কে এই আন্তর্জাতিক ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রবর্ত্তক বলা চলে। এ সম্বন্ধে যিনি কিছুমাত্র আলোচনা করেছেন তিনিই জানেন যে, রোমান ব্যবহার-

শাস্ত্রে লোক ব্যবহারের যে নিয়মগুলি সর্ব্বসাধারণ, সুতরাং স্বাভাবিক বলে' গণ্য হয়েছিল, গ্রোসিয়াস সেই গুলিকেই তাঁর মৈত্রীবিগ্রহ সংহিতার ভিত্তি করেছিলেন। ব্যক্তির নীতিকে সমষ্টির রীতি করে' তোলার এই চেষ্টা কতদূর সফল হয়েছে, ১৯১৪ সালে তার একটা পরীক্ষা আরম্ভ হয়েছে, এবং ১৯১৮ সালেই তার শেষ হয়েছে এমন মনে করবার কোনও সঙ্গত কারণ নেই।

একটা অবান্তর কথা দিয়ে 'আর্য্যামির' এই উৎপত্তি পর্ব্বের অধ্যায় শেষ করা যাক্। ইংরেজ-দার্শনিক হব্‌স্ গ্রোসিয়াসেরই সমসাময়িক লোক ছিলেন। তিনি কল্পনা করেছিলেন যে, আদিতে মনুষ্য-সমাজ রাষ্ট্রবদ্ধ ছিল না। এবং কাজেই পরস্পরের প্রতি ব্যবহারের কোনও বাঁধাবাঁধি নিয়মও চলতি ছিল না। সে ছিল একটা নিত্য বিগ্রহ বিবাদের যুগ, যখন প্রত্যেকেই ছিল প্রত্যেকের শত্রু, এবং সবারই হাত তখন সবারই বিরুদ্ধে তোলা থাকত। এই ভয়ানক দুরবস্থাটা মোচন করবার জন্যই সবাই মিলে একটা "ষ্টেট" গড়ে' তার হাতে আত্মসমর্পণ করেছে, এবং "ষ্টেট" পরস্পরের প্রতি ব্যবহারের আইন-কানুন বেঁধে দিয়ে বৈষম্যের জায়গায় শান্তি এনেছে। বহু পণ্ডিত প্রমাণ করেছেন এবং এখনও করছেন যে, হব্‌সের এই কল্পনাটা একেবারে অনৈতিহাসিক। মানুষ কোনও দিনই সমাজ ছাড়া ছিল না, এবং কোনও রাষ্ট্র-গড়ার মজলিসের প্রসিডিং, কি পাথরে কি তামায়, এ পর্য্যন্ত কোনও পুরাতত্ত্ববিদই আবিষ্কার করতে পারেন নি। কিন্তু একটা সন্দেহ মনে না এসে যায় না। মানুষের আদিম অবস্থার এই যে কল্পনাটা, সেটা হব্‌স্ নিয়েছিলেন তাঁর সমসাময়িক য়ুরোপীয় রাজ্যগুলির পরস্পরের সম্বন্ধ থেকে। অর্থাৎ গ্রোসিয়াস

চেয়েছিলেন, লোক ব্যবহারের নীতি দিয়ে এই সম্বন্ধকে নিয়ন্ত্রিত করতে, আর হব্‌স্ কল্পনা করেছিলেন, এই নীতি নিয়ম প্রচলনের পূর্ব্বে লোকের সঙ্গে লোকের সম্বন্ধ ছিল রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্বন্ধেরই মত। পাঠককে মনে করিয়ে দিচ্ছি যে গ্রোসিয়াসের বিখ্যাত পুঁথির ছাব্বিশ বছর পরে হব্‌সের 'লিভিয়াথন' প্রকাশিত হয়।

(২)

আর্য্যামির জন্মরহস্যটা একবার প্রকাশ হ'লে তার জীবন-চরিতের হেরফেরগুলো বুঝতে আর কষ্ট হয় না।

বড় হোক, ছোট হোক একটা দলের নাম দিয়ে নাকি এ জিনিষটিকে চালাতে হয়, তাই এর শ্রেষ্ঠত্বের দাবীকে অল্পবিস্তর মোটা রকম বাহ্যিক লক্ষণের উপরেই দাঁড় করান ছাড়া উপায় থাকে না। গায়ের চামড়ার রং, মাথার খুলির মাপ, সাগরবিশেষের পশ্চিম পারে কি পর্ব্বতবিশেষের উত্তর ধারে নিবাস স্থান, খাবার জিনিষে নাইট্রোজেনের প্রাচুর্য্য কি স্নেহ-পদার্থের আধিক্য, পূর্ব্বপুরুষ ঘোড়ায় চড়ে' বর্শা চালাতেন কি মাটীতে দাঁড়িয়ে তীর ছুড়তেন, এই রকম যা হোক কিছু একটার উপরেই এক একটা প্রকাণ্ড অভিমানের ইমারত গড়ে' তুলতে হয়। অবশ্য এই চর্ম্মাস্থি-বিদ্যা, ভৌগলিক-তথ্য, ভক্ষ্যাভক্ষ্য-বিচার এর প্রত্যেকটিরই 'ইন্‌য়েণ্ডো' বা ইঙ্গিত হচ্ছে মানসিক ও আধ্যাত্মিক গুণাবলীর এক একটি লম্বা ফর্দ্দ। এ সব লক্ষণের সঙ্গে এ সব গুণের কোনও রকম "অন্যথা সিদ্ধিশূন্য" বা নিত্যসম্বন্ধ আছে কিনা সে সন্দেহে আর্য্যামির অভিমানকে কখনও সঙ্কুচিত হতে হয় না।

কেননা লক্ষণগুলি হ'ল বাহ্যিক অর্থাৎ প্রত্যক্ষ, আর গুণগুলি হ'ল নিগূঢ় অর্থাৎ আনুমানিক। প্রত্যক্ষ নিয়ে তর্ক চলে না, আর তর্কের ভূমিই হ'ল অনুমান। এবং তর্ক জিনিষটার সুবিধা এই যে, এ ব্যাপারে পরাজয় নির্ভর করে বিপক্ষের শক্তির উপর নয়, নিজের ইচ্ছার উপরে। নিজে স্বীকার না করলে তর্কে হার হয়েছে, এ অবশ্য কেউ প্রমাণ করতে পারবে না। কেননা সেইটিই হবে আবার একটা তর্কের বিষয়।

ব্যক্তির অহঙ্কারের চেয়ে সমষ্টির অহঙ্কারের একটা শ্রেষ্ঠত্ব এই যে, একা একা যা নিয়ে কোনও রকমেই অহঙ্কার করা চলে না, দল বেঁধে তাকেই একটা দুর্জ্জয় অহঙ্কারের কারণ করে' তোলা যায়। এক যুগের ফরাসীরা সে যুগের ইংরেজদের বুদ্ধি-সুদ্ধিতে বিশেষ মুগ্ধ না হয়ে, তাদের নাম দিয়েছিল 'জন বুল'। আজ ইংলণ্ডের খবরের কাগজ লেখকেরা এই নামটাকেই একটা উৎকট জাতীয় অভিমান প্রকাশের রাস্তা করে' তুলেছে। এ জাতির বুদ্ধি যে একটু মোটা বলে' বোধ হয়, তার কারণ এ বুদ্ধি হাল্‌কা নয়, গুরুতর রকমের ভারী; এতে যে বেশি ঢেউ খেলে না, এর অতলস্পর্শ গভীরতাই হ'ল তার কারণ; এ জাত যে চট্ করে' একটা 'থিওরী' কি 'আইডিয়েল' নিয়ে মেতে ওঠে না তার কারণ এদের স্থির 'প্র্যাক্‌টিকাল' বুদ্ধি; ফরাসির মত এদের সাম্য ও স্বাধীনতা একদিনে কুড়িয়ে পাওয়া নয়, কারণ নজীরের পর নজীর ধরে' ক্রমশ এর আয়তন বৃদ্ধি হচ্ছে, সেইজন্য গতিটা একটু মন্থর। কিন্তু আমার সন্দেহ হয় যে, 'জনবুলত্বের' এত গুণব্যাখ্যান সত্ত্বেও কোনও ইংরেজ এটা স্বীকার করতে রাজী হবে কিনা, তার নিজের বুদ্ধিটা আপাতদৃষ্টিতেও একটু মোটা, যতই গুরুত্ব এবং গভীরতা সে

দৃষ্টিবিভ্রমের কারণ হোক না কেন। অর্থাৎ 'জনবুলত্বের' উপর জাতীয় অভিমান অনায়াসে দাঁড় করান যায়, কিন্তু কোনও ব্যক্তির পক্ষে ওটাকে নিয়ে অহঙ্কার দেখান একটু শক্ত। বোধ হয় ঠিক এই কারণেই আমাদের জাতীয় চরিত্রের দুর্ব্বলতাগুলিকে লজ্জা দিয়ে বিদায় করবার প্রবন্ধে, গানে, বক্তৃতায় যে সব চেষ্টা হয়েছে, তাতে তেমন আশানুরূপ ফল দেখা যায় নাই। কেননা লজ্জা জিনিষটা মানুষে পায় কোনও কারণে দল থেকে তফাৎ হ'য়ে পড়তে হ'লে। সুতরাং সবাই মিলে দল বেঁধে লজ্জা পাওয়াটা বড় একটা সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। বরং জাতীয়-জীবনের অবস্থা দেখে সবাই মিলে যে লজ্জা পাওয়ার চেষ্টা করছি এই ব্যাপারটিকেই একটা অহঙ্কারের কারণ করে' তোলা কিছুই কঠিন নয়।

(৩)

'আর্য্যামি' যত রকমের আছে, বলা বাহুল্য, তার মধ্যে সেরা হচ্ছে জন্মগত 'আর্য্যামি'। এর কারণও খুব স্পষ্ট। জন্মকে ভিত করে' 'আর্য্যামির' অহঙ্কার দাঁড় করানো যেমন সহজ, এর শ্রেষ্ঠত্বের স্পর্দ্ধাটাও হয় তেমনি গগনস্পর্শী। জন্মের উপর যে জীবের গুণাগুণ নির্ভর করে তা ঘোড়ার বংশে যখন ঘোড়া আর গরুর বংশে গরুই জন্মাচ্ছে তখন অস্বীকার করবার জো নেই। আর এ ভেদটা যে কেবল পৃথক জাতীয় ভেদ নয় স্বজাতীয় ভেদও বটে সে কথা নবীন লেখক হাউস্টন চেম্বারলেইন ও প্রাচীন ঋষি বসিষ্ঠ (১) দু'জনেই তেজী ঘোড়ার

(১) "কুলাপদেশেন হয়োঽপি পূজ্য—
স্তস্মাৎ কুলীনাং স্ত্রিয়মুদ্বহন্তি॥" (বসিষ্ঠ-সংহিতা।)

উঁচু বংশের দৃষ্টান্ত আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং জন্মের উপর শ্রেষ্ঠতার দাবীকে ভিত্তিহীন বলে' সরাসরি অগ্রাহ্য করা চলে না, এবং এ দাবী উপস্থিত করতেও এক জন্মান ছাড়া আর কিছুই অপরিহার্য্য নয়। কোনও বিশেষ বংশের সঙ্গে বিশেষ গুণের যোগাযোগ আছে কিনা সে তর্ক তোলা যায় বটে, কিন্তু এর মীমাংসার কোনও সম্ভাবনা না থাকাতে কারও কোনও ভয়ের কারণ নেই। বর্ত্তমান বংশধরদের মধ্যে গুণটা না থাকলেই যে সে গুণ বংশে নেই এটা একেবারেই প্রমাণ হয় না। কেননা বর্ত্তমানে হয়ত-ওটা 'লেটেণ্ট' ভাবে রয়েছে, ভবিষ্যবংশীয়দের মধ্যে ঠিক ফুটে বেরুবে! 'অ্যাটেভিজম' যে একটা প্রত্যক্ষ ব্যাপার তার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত ত ডারুইনের পুঁথিতেই রয়েছে! 'জার্ম্ প্ল্যাস্ম্' জিনিষটি যে অমর, সে তথ্য বাইস-ম্যানই প্রমাণ করে' গেছেন!

আর এই সহজ দাবীটির বহরই বা কি বিরাট। এ যে শ্রেষ্ঠত্ব, এ মিশে রয়েছে একেবারে রক্তের সঙ্গে, তৈজস-নাড়ীর অণুতে অণুতে। যার সঙ্গে সে রক্তের সম্পর্ক নেই, সে সারা জীবন তপস্যাতেও এর কাছে ঘেঁসতে পারবে না। অথচ এই দুর্লভ মহত্ব যারা পেয়েছে তারা পেয়েছে একবারে বিনা আয়াসে; মিতাক্ষরা বংশের ছেলের মত কেবলমাত্র জন্মের জোরে ও জন্মের সঙ্গে। একে লাভ করতেও যেমন আয়াস নেই, বজায় রাখতেও তেমনি কষ্ট নেই। কেননা এ শ্রেষ্ঠত্বকে ঝেড়েও ফেলা যায় না, এর নষ্ট হবারও ভয় নেই। সহজ কথায় জন্মগত আর্য্যামিটি হচ্ছে দল বেঁধে প্রতিভা ও আরও কিছু উপরির দাবী। কেননা প্রতিভারও উত্তরাধিকার নেই।

এ কথা বোধ হয় আর না বললেও চলে যে, যে মিত্রি-বংশের গৌরব ও নয়নজোড়ের বাবুয়ানা.....থেকে আরম্ভ করে' কুলীনত্ব, ব্রাহ্মণত্ব, দ্বিজত্ব, শ্বেতচর্ম্মত্ব এবং অবশেষে আর্য্যত্ব পর্য্যন্ত সবই হ'ল জন্মগত আর্য্যামিরই প্রকারভেদ। এর প্রতিটিই একটা না একটা আস্ত দলের পক্ষে অসাধারণত্বের দাবী। অবশ্য কোন দল ছোট, কোনটি মাঝারি, কোনটি অতি প্রকাণ্ড। কিন্তু সর্ব্বত্রই দলের লোকদের পরস্পর সম্বন্ধ হচ্ছে সপিণ্ড সম্বন্ধ, হয় বস্তুগত্যা, নয় কল্পিত। তবে এ সপিণ্ডত্বের সাত পুরুষে নিবৃত্তি হয় না। দরকার হলে একে ব্রহ্মার মুখ পর্য্যন্ত, কি আদি আর্য্যভূমির আদিম আর্য্য-দম্পতি পর্য্যন্ত অনায়াসে টেনে নেওয়া চলে। এবং যাঁরা খবর রাখেন, তাঁরা বোধ হয় এর একটাকে আর একটার চেয়ে বড় বেশি অপ্রামাণ্য বলতে সাহসী হবেন না।

(৪)

জন্মগত আর্য্যামি এ পর্য্যন্ত যত রকমের দল ধরে' প্রকাশ হয়েছে, তার মধ্যে সব চেয়ে বড় দল হ'ল আর্য্যত্বের দল। আর্য্যামি ও আর্য্যত্ব দুটি যে এক জিনিষ নয়, দ্বিতীয়টি প্রথমটিরই প্রকারবিশেষ মাত্র, এত-ক্ষণের আলোচনায় এ কথাটি নিশ্চয়ই পরিষ্কার হয়েছে; সুতরাং এর পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু এই 'আর্য্যামি'বিশেষের দু'-একটি বিশেষত্বের আলোচনা না করলেই নয়। কেননা আর্য্যামি'র এই বিরাট প্রকাশটিকে একবার ধারণা করতে পারলেই আর্য্যামির স্বরূপ বুঝতে আর কিছু বাকী থাকবে না।

এই আর্য্যামির ছোটখাট দাবীটি কতকটা এই রকমের :— পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টির পর থেকে যত সব জাতির আবির্ভাব হয়েছে, আর্য্যজাতি যে তাদের মধ্যে কেবল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তা নয়, তার শ্রেষ্ঠত্ব একবারে অতুলনীয়। আর্য্যেতর কোনও জাতির সঙ্গে শরীরে কি মনে তার কোনও তুলনাই চলে না। আদিকাল থেকে একাল পর্য্যন্ত মানব-সভ্যতার যা কিছু সৃষ্টি তা সবই হয়েছে আর্য্যজাতির কোনও না কোনও শাখার হাত দিয়ে। অন্য সব জাতির সামান্য যা দান, তা সফল ও সার্থক হয়েছে, কেবল আর্য্য-মহারাজ তা গ্রহণ করে' নিজস্ব করেছেন বলে'। এ জাতির যা আচার, ব্যবহার, ধর্ম্ম, সমাজ তাই হ'ল সদাচার, সদ্ধর্ম্ম, শিষ্ট সমাজ, আর এর বাইরে সবই 'অনার্য্য' ও 'বারবারিক'। সুতরাং "পৃথিবীর আধিপত্যে আর্য্যজাতির যে দাবী, সে খাঁটি ন্যায়ের দাবী। গ্রীক-আর্য্য অ্যারিস্টটল বলেছেন যে হঠাৎ যদি পৃথিবীতে একদল লোকের আবির্ভাব হয়, যারা কেবল শরীরের আয়তনে ও গড়নে দেবতাদের মত আর সব মানুষের চেয়ে তফাৎ ও শ্রেষ্ঠ তবে সবাই নির্ব্বিবাদে স্বীকার করবে যে, আর সমস্ত লোকের উপর তাদের আধিপত্যের ধর্ম্ম ও ন্যায়সঙ্গত অধিকার রয়েছে। এবং যদি কেবল সামান্য দেহের সম্বন্ধেই এ কথা ঠিক হয়, তবে মনে যারা অসাধারণ সাধারণ লোকের উপর তাদের আধিপত্যের অধিকারটা কত বেশি!" এই কথাটাই খুব অল্পের মধ্যে প্রকাশ করে' তিনি বলেছেন যে, 'এক জাতির লোক স্বভাবতই স্বাধীন, আর এক জাতি লোকের স্বভাবই দাসত্ব।' এই হচ্ছে সার সত্য। কেননা ন ত জিনিষটা মনুষ্যত্বের সামান্য ধর্ম্ম নয় যে সব মানুষেরই তাতে কোনও অধিকার আছে; কারণ এ ত খুব স্পষ্ট যে, সে অধিকার নির্ভর করে

স্বাধীনতার ক্ষমতার উপর যার ভিত্তি হ'ল দেহের ও মনের শক্তি। এ কথা খুব নির্ভয়েই বলা চলে যে, অনেক জাতির লোক রয়েছে স্বাধীনতার কল্পনাও যাদের অজ্ঞাত। সেইজন্য দাসত্ব কি প্রভুত্ব দুই অবস্থাই তাদের সমান। যতটুকু উন্নতি তাদের সম্ভব, অবস্থাভেদে তার কোনও প্রভেদ ঘটে না। ঈহুদি, চীনা, সেমিটিক ও অর্দ্ধসেমিটিক জাতিগুলি এর দৃষ্টান্ত।"

উপরের বর্ণনায় আর্য্যজাতির আধিপত্য-দাবীর অংশটা, অর্থাৎ এ ন্যায়ের প্রতিজ্ঞাটি, প্রসিদ্ধ লেখক হাউস্টন চেম্বারলেইনের 'ঊনবিংশ শতাব্দীর ভিত্তি' নামক অপূর্ব্ব গ্রন্থ থেকে অনুবাদ করে' দিয়েছি। চেম্বারলেইন জাতিতে ইংরেজ, শিক্ষায় জার্ম্মান; এবং তাঁর পুঁথি রচনা করেছেন জার্ম্মানভাষায়। যাঁরা চেম্বারলেইন-এর মতামতের খুব সদয় সমালোচক নন তাঁরাও স্বীকার করেছেন যে, তাঁর হাতের কলম হ'ল সোনার কাঠি। বস্তুত সে কলম যে সলীল ও স্বচ্ছন্দ গতিতে প্রাচীন ও আধুনিক য়ুরোপীয় সভ্যতার বিচিত্র ইতিহাসের উপর দিয়ে চলে গিয়েছে, তাতে মুগ্ধ না হয়ে উপায় নেই। তাঁর গ্রন্থের প্রায় প্রতি পৃষ্ঠা থেকে যে রসজ্ঞতা ও সূক্ষ্ম-বিশ্লেষণ, শ্রদ্ধা ও ঘৃণা, অনুরাগ ও বিদ্বেষের তীব্র আলো ঠিকরে পড়ছে তাতে অল্প-বিস্তর চোখ না-ঝলসে যায় না। কিন্তু আর্য্যজাতির পক্ষে এই যে সর্ব্বাধিপত্যের দাবী, যা তাঁর পুঁথিতে গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত বারবার উপস্থিত করা হয়েছে, এর কদর্য্যতা ও ভীষণতা চেম্বারলেইন-এর কলমের কালিতেও একটুকও ঢাকা পরে নি।

কেননা এর পাণ্ডিত্যের পোষাক আর যুক্তির মুখোস খুলে ফেললে যা বেরিয়ে পরে, সে হচ্ছে আদিম নগ্ন বর্ব্বরতা, যা নিজের

দলের বাইরে কাকেও শত্রু ছাড়া আর কিছু মনে করতে পারে না। এবং হয় মৃত্যু নয় দাসত্ব এ ছাড়া সে শত্রুতার আর কোনও অবসানও কল্পনা করতে পারে না। হয় ত মানুষের ইতিহাসে এমন একদিন ছিল যখন সমস্ত জাতি মানুষের দল, কি আর্য্য কি অনার্য্য, এই মনোভাব নিয়েই প্রতিবেশী অন্য সব দলের উপর চোট করত। এবং এও সম্ভব যে এই নির্ম্মম বিরোধের উষ্ণ রক্তের স্পর্শেই মানুষের সভ্যতার প্রথম উন্মেষ ঘটেছে; তার সমাজ, রাষ্ট্র ও ব্যবহারে প্রাণ ও গতিসঞ্চার হয়েছে। কিন্তু মানুষের এই যে আদিম ভয় ও বিদ্বেষ, লোভ ও নিষ্ঠুরতা, এ হ'ল প্রকৃতির অদম্য ও অন্ধ শক্তিরই রূপান্তর। এ তর্ক করে না, যুক্তি দেয় না, ন্যায়ের দোহাই পাড়ে না, সুন্দরবনের বাঘের মত শিকার দেখলেই তার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে। দামোদরের বন্যার ধ্বংশলীলার মত ধর্ম্ম-শাস্ত্রের প্রমাণে এরও কোনও বিচার চলে না। কিন্তু যখনি তর্ক করে', যুক্তি দিয়ে, ন্যায়-ধর্ম্মের ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করে' জাতির উপর জাতির আধিপত্যকে, দলের সঙ্গে দলের শত্রুতাকে খাড়া রাখতে হয় তখনি বুঝতে হবে যে, সে জাতি প্রকৃতির গোড়ার ধাপ ছাড়িয়ে উঠেছে। কারণ সে জাতির কাছে নিঃসন্দেহ প্রমাণ হয়েছে যে জাতির সঙ্গে জাতির, দলের সঙ্গে দলের এক শত্রুতার সম্বন্ধ ছাড়া অন্য সম্বন্ধ সম্ভব, এবং সেই সম্বন্ধই নিত্য ও ঘনিষ্ঠ। এ ধাপে দাঁড়িয়ে প্রকৃতির ধর্ম্মকেই ধর্ম্মের বিচারে আশ্রয় করলে ধর্ম্মও এখন তাকে বিচার করবে। প্রস্তাবনা ও প্রথম অঙ্ককে সমস্ত নাটকের ভিতর দিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে টানতে চেষ্টা করলে কাব্যের সৌন্দর্য্য তাতে কেবল আঘাতই পাবে।

মানুষের সভ্যতায় আর্য্যজাতির দান অনেক, হয়ত অপূর্ব্ব ও

অতুলনীয়। কিন্তু মানুষের উপর তার আর্য্যামির আঘাতও কম প্রচণ্ড নয়। আর্য্য-রোম অনার্য্য-কার্থেজকে একবারে ধূলা না করে' তৃপ্ত হয় নাই, অর্থাৎ অন্য একটা সভ্যতাকে একবারে ধ্বংশ না করে' নিজের সভ্যতাকে বজায় রাখবার কোনও পথ সে খুঁজে পায় নি। যে হিন্দু আর্য্য ওষধি ও বনস্পতিতে বিশ্বপ্রাণের স্পন্দন উপলব্ধি করেছে, 'দস্যু' ও 'রাক্ষসের' প্রাণের উপর সেও কোনও মায়া দেখাই নি। আধুনিক য়ুরোপীয় আর্য্য দুটি মহাদেশ থেকে সেখানকার অনার্য্য অধিবাসীদের একেবারে মুছে ফেলেছে, এবং আর একটা মহাদেশ থেকেও মুছে ফেলবার চেষ্টায় আছে। এ চেষ্টার সমর্থনে যুক্তির অবশ্য অভাব নেই। এই উচ্ছেদ ও ধ্বংশ না হ'লে যে আধুনিক আর্য্যসভ্যতার গৌরব, তার বিকাশই হতে পারত না। এই গরীয়সী সভ্যতাকে পৃথিবীময় ছড়িয়ে দেওয়াই হ'ল ধর্ম্ম। এবং যাদের রক্তের মধ্যে এই সভ্যতা রয়েছে তাদের সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়া ছাড়া এর অন্য কোনও উপায় নেই। তাতে যদি অন্য সব জাতিকে পৃথিবী ছেড়ে গিয়েও এর যায়গা করে' দিতে হয় মানব-জাতির পক্ষে সেও মঙ্গল। লক্ষ্মণের কাছে অগস্ত্য-ঋষির পরিচয় দিতে রামচন্দ্র তাঁকে 'পুণ্যকর্ম্মা' বলে উল্লেখ করেছেন, কেননা তাঁর ত্রাসে দক্ষিণদিকে "রাক্ষসেরা" পা বাড়াতে সাহস না করায় সে দিকটা "লোকদের" বাসের উপযুক্ত হয়েছে। এবং এ যুক্তির উত্তর দেওয়াও কঠিন। কেননা যা ঘটেছে তার বিরুদ্ধে যা ঘটে নি তাকে ওজনে তোলা চলে না। বর্ত্তমান আর্য্যসভ্যতা না গড়ে উঠলে আর্য্য-অনার্য্য মিশাল সভ্যতা কি রকমের হ'ত, কি তেমন কোনও সভ্যতা সৃষ্টি হতে পারত কি না এ তর্ক এখন তোলা একবারেই নিষ্ফল,

কারণ এর কোনও রকম মীমাংসার সুদূর সম্ভাবনাও নেই। কিন্তু শ্রেষ্ঠত্বের উপর আধিপত্য ও উচ্ছেদের দাবীটা যে কত অচল, মানুষের সভ্যতার গোটা ইতিহাসটাই তার প্রমাণ। এ দাবীর গোড়ার কল্পনা হ'ল এই যে, যে জাতি একবার বড় হয়ে উঠেছে সে চিরকালই বড় থাকবে, এবং আর কেউ বড় হয়ে উঠতে পারবে না। অথচ যে সব জাতির পর জাতি এতকাল ধরে' মানুষের সভ্যতাকে কখনও ধীরে কখনও দ্রুত গড়ে তুলেছে তাদের কেউ কারও বংশধর নয়। আজই কি হঠাৎ মানুষের সভ্যতায় এই ধ্বংশ ও সৃষ্টির লীলা থেমে গেল! অথচ চিরকালই ত যে মাথায় উঠেছে সেই মনে করেছে সে একেবারে অচ্যুত। এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্রেষ্ঠ জাতির পতন হলেও তার যে কেন সেটা ঘটবে না তার কারণ খুঁজে বের করতে কারও কখনও কষ্ট হয় নি। প্রতিদিন জীব যম-মন্দিরে যাচ্ছে দেখেও অমরত্বের কল্পনা আশ্চর্য্য সন্দেই-নেই, কিন্তু আরও বেশি আশ্চর্য্য এই কল্পনা যে, যারা বেঁচে আছে তারা যে কেবল অমর হবে তা নয়, কিন্তু আর নতুন কারও জন্মও হবে না।

(৫)

আর্য্যত্বের 'আর্য্যামি' এতক্ষণ যা বর্ণনা করেছি সে হ'ল তার একটা মাত্র দিক। কেননা ব্রহ্মের যেমন দুইরূপ, এ আর্য্যামিরও তেমনি দুই মূর্ত্তি; সগুণ ও নির্গুণ, ক্রিয়াশীল ও নিষ্ক্রিয়। বলা বাহুল্য যে, বর্ত্তমানে এর প্রথমটির বিকাশ হয়েছে য়ুরোপের আর্য্য-সমাজে, দ্বিতীয়টির পূর্ণ-প্রকাশ আর্য্যভূমি ভারতবর্ষে। পশ্চিম শাখাটি দাবী

করছে সর্ব্বজ্ঞত্ব ও সর্ব্বেশ্বরত্ব; তার ক্রিয়ার দাপটে আর সকলের হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া এক রকম রুদ্ধ। আর পূবের শাখাটি "নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং", "অপ্রাণ" ও "অমন"। সকলেই জানে যে সগুণত্বের সিঁড়ি দিয়েই নির্গুণত্বে পৌঁছিতে হয়। ভারতীয় আর্য্যেরাও অবিশ্যি তাই করেছেন। ক্রিয়াশীলত্বের সিঁড়ি দিয়ে নিষ্ক্রিয়ত্বের ছাদে এসে পৌঁচেছেন। এটা যে চরম পরমার্থের অবস্থা তাতে সন্দেহ নেই, কেননা 'একরূপে অবস্থিত যে অর্থ' তাই হ'ল পরমার্থ। যাঁরা এ অবস্থা থেকে ভারতের আর্য্য-সমাজকে আবার সচল অবস্থায় নিতে চান তাঁরা 'ইভলিউশনের' গতিবিধির কোনও খবরই রাখেন না।

যা হোক, আর্য্যামির এই সগুণ ও নির্গুণ প্রকাশের মধ্যে একটি আন্তরিক মিল রয়েছে, কেননা এ দুই হ'লেও মূলে এক। সে মিলটি হচ্ছে যে, দুয়ের পথই বিবেকানন্দ যাকে বলেছেন 'ছুঁৎমার্গ', বাইরের স্পর্শ থেকে বাঁচিয়ে নিজের শুচিতা রক্ষা করা। তবে পশ্চিমের, ওদের পথ হ'ল আর সবাইকে তাড়ান, আমাদের কৌশল হ'ল সবার কাছ থেকে পালান। শেষ পর্য্যন্ত কোনটায় বেশি ফল হয় বলা কঠিন।

মানুষে মানুষে চরিত্র ও মনের শক্তির যে তফাৎ, জাতির সঙ্গে জাতির সে তফাতের চেষ্টার কোনও অর্থ আছে কি না, এবং থাকলে সেটা ঠিক কোথায় সে তর্ক না হয় নাই তোলা গেল। মেনে নেওয়া যাক, এ তফাৎ আছে। কিন্তু প্রভেদমাত্রই উঁচু নীচুর সম্বন্ধ নয়, এবং বর্ত্তমান পর্য্যন্ত কাজের পরিমাণও একটা জাতির শক্তিসামর্থ্যের শেষ প্রমাণ নয়। কেননা মানুষের ইতিহাস কিছু শেষ হয়ে যায় নি যে, এখনি লাইন টেনে হিসাব নিকাশ আরম্ভ করা যেতে পারে। আজ

যারা পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ ও প্রবল, তারা ট্যাসিটাসের জর্ম্মাণেরই বংশধর। তখন দাঁড়ি টেনেছিলেন বলে' ট্যাসিটাসের ঠিকে যদি ভুল হয়ে থাকে, তবে এখন দাঁড়ি টেনে ষ্টুয়ার্ট চেম্বারলেইন-এর ঠিকই বা শুদ্ধ হবার সম্ভাবনা কোথায়! আর শ্রেষ্ঠত্ব, তার অর্থ যাই হোক, যদি প্রভুত্বের নিয়োগপত্র হয়, তবে তার শেষ কোথায়? আর্য্যত্ব এমন কি য়ুরোপীয় আর্য্যত্বের সীমায় এসেই বা তার গতি রোধ হবে কেন? শ্রেষ্ঠের মধ্যেও শ্রেষ্ঠতমের দাবী কেনই বা না চলবে! কেননা, 'আর্য্যামি' ভেদেরি মন্ত্র, মৈত্রীর বন্ধন নয়। শোনা যাচ্ছে যে বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হবার পরেই ফ্রান্সের নৃ-তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা প্রমাণ করেছেন যে, প্রুশিয়ানরা মোটেই আর্য্যজাতির লোক নয়, তারা য়ুরোপের প্রস্তর যুগের অধিবাসিদের একবারে অবিমিশ্র বংশধর। এবং সে যুগের যে সব মাথার খুলি পাওয়া গেছে, তার সঙ্গে বর্ত্তমান কালের যে মাথার সব চেয়ে আশ্চর্য্যজনক মিল, সে হচ্ছে প্রিন্স বিসমার্কের মাথা।

মানুষের সভ্যতা যাঁরা গড়ে তুলেছেন, তাঁরা সবাই অসাধারণ মানুষ। কিন্তু কোনও বিশেষ বংশ, কুল বা জাতি থেকে তাঁরা আসেন নি। এবং নিজের বংশ, কুল বা জাতির সঙ্গে তাদের যে মিল তার চেয়ে অনেক বেশি মিল পরস্পারের সঙ্গে। প্রকৃতির এই যে ইঙ্গিত, এই হ'ল মানুষের মিলনের সত্য পথের ইঙ্গিত। বংশ, কুল, জাতি কিছুই অসত্য নয়, কিন্তু সে সত্য হ'ল ব্যবহারিক। এরা কাজ চালাবার উপায়, কিন্তু মৈত্রীর সম্বন্ধ কাজের সম্বন্ধ নয়। এই কাজ চালাবার দলকে ধরে' মানুষের মধ্যে মৈত্রীস্থাপনের চেষ্টা পণ্ডশ্রম। কেননা দলের সঙ্গে দলের সম্বন্ধ সব সময়েই থাকবে কাজের সম্বন্ধ, সে 'অ্যালায়েন্স'ই হোক, 'অ্যাঁতাত'ই হোক, আর 'লীগ অব নেশন'ই

হোক। তাতে শান্তি আসতে পারে কিন্তু মৈত্রী আসবে না। কেননা মৈত্রীর জন্য চাই মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন, দলের সঙ্গে দলের আদান প্রদান নয়। এবং সে কেবল তখনই সম্ভব, যখন বংশ, জাতি, রাষ্ট্রের প্রাচীর মানুষের চেয়েও উঁচু হয়ে' উঠে দৃষ্টিকে বাধা না দেয়; যখন নামরূপের মায়া যা এক, তাকে বহু করে' দেখানোর কাজ থেকে নিবৃত্ত হয়।

শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত।

সম্পাদকের নিবেদন।

—:০:—

"সবুজ পত্রে"র বয়েস আজ পাঁচ বৎসর পূর্ণ হল। গত তিন বৎসর সবুজ পত্রকে টিঁকিয়ে রাখা যে আমার পক্ষে সহজসাধ্য ব্যাপার হয়নি, তা "সবুজ পত্রে"র গ্রাহকমাত্রই জানেন।

মাসের পর মাস ধার্য্য তারিখে আমি পাঠক-সমাজের নিকট এ পত্র পেশ করে উঠতে পারি নি। এর প্রধান কারণ, কি "সবুজ পত্রে"র সম্পাদক কি লেখক কেউ সাহিত্য ব্যবসায়ী নন, সকলেই অন্য কাজের কাজী। এঁদের সকলকেই, অবসর মত লেখায় হাত দিতে হয় এবং বলা বাহুল্য সে অবসর এঁদের কারও ভাগ্যে নিত্য নিয়মিত জোটে না। কাজেই "সবুজ পত্র" যথাসময়ে দেখা দেয় না।

তারপর, "সবুজ পত্র" নিয়মিত প্রকাশ করবার দায়ীত্ব এক সম্পাদক ছাড়া আর কারও নেই। এ দায়ীত্ব-জ্ঞান আমার অবশ্য যথেষ্ট আছে। কিন্তু শুধু জ্ঞান থাকলে কি হবে, সে জ্ঞান অনুসারে কাজ করবার শক্তি আমার নেই। লেখা সম্বন্ধে আমি মোটেই ক্ষীপ্র-হস্ত নই, আমি ধীরে লিখি এবং ধরে লিখি, এবং তার পর যদি হাতে সময় থাকে ত, সে লেখা আমি কাটি, ছাঁটি, মাজি, ঘসি, এক কথায় চৌকোশ এবং চৌরস করতে চেষ্টা করি। এবং এই কাটছাঁট করবার সময় আমার হাতে নিত্য থাকে না বলে, আমার যখন তখন কলম ধরতে প্রবৃত্তি হয় না, ফলে "সবুজ পত্রে"র আবির্ভাব মুলতবি থেকে যায়।

পাঠক বলতে পারেন যে, এ অবস্থায় "সবুজ পত্র" বন্ধ করে' দেওয়াই শ্রেয়। এ কথা ঠিক এবং সেইজন্য আমিও মনস্থ করেছিলুম যে, অতঃপর "সবুজ পত্র" বন্ধ করে' দেব। এ সংকল্পের আরও একটি কারণ আছে।

আপনারা সকলেই জানেন যে, এই যুদ্ধের প্রসাদে একদিকে যেমন সাহিত্যের আদর কমে এসেছে, অপরদিকে তেমনি কাগজ কালি প্রভৃতির দর বেড়ে গিয়েছে। ফলে গত তিন বৎসর ধরে, "সবুজ পত্রে"র জন্য আমাকে যথেষ্ট অর্থদণ্ড দিতে হয়েছে। বছরের পর বছর এতটা লোকসান দেওয়া আমার অবস্থায় কুলোয় না। আশা ছিল, এই যুদ্ধের অবসানে কাগজের বাজার পড়ে' যাবে, কিন্তু বস্তুগত্যা সে বাজার ক্রমে চড়েই যাচ্ছে। সুতরাং লেখার দিক থেকেই দেখি আর টাকার দিক থেকেই দেখি, দু'দিক থেকেই "সবুজ পত্র" চালাবার উৎসাহ আমার নিতান্ত কমে এসেছিল।

এ সব কারণ সত্ত্বেও "সবুজ পত্র"কে অন্তত আর এক বৎসরের জন্য বাঁচিয়ে রাখতে যে প্রস্তুত হয়েছি, তার কারণ এ পত্রের প্রতি যাঁদের অনুরাগ আছে, দেখতে পাই তাঁদের সকলের মতেই আজকের দিনে, "সবুজ পত্র" বন্ধ করে' দেওয়াটা সঙ্গত নয়। এবং আমার বিশ্বাস "সবুজ পত্রে"র অধিকাংশ গ্রাহকও এই মতে সায় দেবেন। অতএব গ্রাহক-সম্প্রদায়ের নিকট আমার নিবেদন এই যে, তাঁরা প্রত্যেকেই যদি আর একটি করে টাকা অর্থদণ্ড দিতে স্বীকৃত হন, তাহ'লে আমার ঘাড় থেকে ব্যয়ভার অনেকটা নেমে যাবে। আশা করি এ প্রস্তাবে "সবুজ পত্রের" কোন গ্রাহকই অসম্মত হবেন না। ইতি

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।